সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

সিদীপের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

শাহজাদপুর ব্রাঞ্চে সিদীপ-শিক্ষালোক বুকশেলফের জন্য বই উপহার দিচ্ছেন পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব ফজলুল হক খান

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

শিক্ষালোক

ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ ● ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

দরকার কয়েকটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় ২
মানসম্মত শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানার্জন ৫
হাতে-কলমে শিক্ষা ৭
পিঁয়াজ-রসুনের বাতচিত ১১
মানুষ হবো কি? ১৩
কবিতা ও আঁকাআঁকি ১৪
স্কুলে দুপুরের খাবার ১৬
বর্তমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৭
ছাতক: সরকারি সিমেন্ট কারখানা ১৮
দেশ ও যুব সমাজ ১৯
নেপাল সফর ও হিমালয় দেখা ২০
সিদীপের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৩
উন্নয়ন মেলা-২০১৯ ২৪
সিদীপ-শিক্ষালোক দেয়াল গ্রন্থাগার ২৬
শিক্ষা বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতা ২৭
চিত্রকলা ২৮

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের ছবি
ইলেজিবল
(মিশ্র মাধ্যম)
শিল্পী সঞ্চয় সুমন

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনফ্রা-রেড, ফোন: ৯১২১৪৭২

সম্পাদকীয়

আমাদের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের চলতি সংখ্যায় সর্বস্তরে মানসম্মত শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রদানের আকাঙ্ক্ষা ও তার বাস্তব রূপায়ণের একটি উপায়ও ব্যক্ত হয়েছে প্রথম লেখাটিতে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার আনুভূমিক প্রসার হচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। মান বৃদ্ধির জন্যও নানরাকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। স্কুলগুলোতে দুপুরের খাবার সরবরাহ বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও পড়ালেখার মান বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে আমাদের ধারণা। তারপরও সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের যেতে হবে অনেক দূর।

শিক্ষা বিষয়ক এসব ভাবনা ছাড়াও চলতি সংখ্যায় আছে পিকেএসএফ আয়োজিত উন্নয়ন মেলা-২০১৯-এর কথা। আছে নেপাল ভ্রমণ, সিদীপের প্রতি ব্রাঞ্চে একটি করে বুক-শেলফ তৈরির মাধ্যমে দেয়াল গ্রন্থাগার তৈরির একটি ধারণা ও তা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ, শিক্ষা বিষয়ক একটি বই নিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রচনা-প্রতিযোগিতা ও আলোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা।

এছাড়াও থাকছে কিছু কবিতা ও চিত্রপ্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@gmail.com, web: www.cdipbd.org

দেশে দরকার কয়েকটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত

পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ইতালির 'বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষাভাষী বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় 'অক্সফোর্ড'। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ জানা না গেলেও অনুমান করা হয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। ঐ সময় ইংল্যান্ডের একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ডের পণ্ডিতদের সাথে স্থানীয় লোকদের বিবাদ লেগেই থাকত। শ্রেণিবিভেদ আর চার্চের বিষোদ্‌গার মিলে ১৩শ শতকের শুরুর দিকে অক্সফোর্ডে শুরু হয় এক ভয়াবহ দাঙ্গা। ঐ সময়ে ভিন্নমত পোষণকারী অনেক শিক্ষার্থী এবং পণ্ডিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেন ক্যামব্রিজ শহরে। আর এভাবেই অক্সফোর্ড থেকে পালিয়ে আসা কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হাতে গড়ে ওঠে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ১২৩১ সালে রাজা তৃতীয় হেনরি অক্সফোর্ডের পাশাপাশি ক্যামব্রিজকে রয়্যাল চার্টার প্রদান করে করমুক্ত ঘোষণা করেন। এভাবেই প্রাচীনতম দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ইংল্যান্ডের দুটি শহরকে পৃথিবীর মানচিত্রে এক অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি জ্ঞান সৃষ্টি করার মাঝেও অনন্য হয়ে ওঠে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়।

শত শত বছর ধরে নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে এমন কঠোরভাবে শিক্ষা এবং গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণ করতে করতে এগিয়ে চলা বিরল দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এই 'অক্সব্রিজ'। যে কোনো র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রায় প্রতি বছরই বিশ্বসেরা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই অবস্থান করে অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ। এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। তবে একটি কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সম্পদের অর্থমূল্য ছিল ৪.০ বিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা)। একই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট খরচ ছিল ২.১ বিলিয়ন পাউন্ড। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সম্পদের অর্থমূল্য ছিল ৫.২ বিলিয়ন পাউন্ড। ঐ অর্থবছরে মোট খরচ ছিল ১.৯ বিলিয়ন পাউন্ড যা বাংলাদেশি টাকায় ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট ছিল ৬৬৪ কোটি টাকা, ঐ অর্থবছরে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ছিল মাত্র ১৮৬ কোটি টাকা। অবাক করার মতো বিষয়, অক্সফোর্ড কিংবা ক্যামব্রিজের মোট আয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসে সরকারি অনুদান থেকে। বাকি অর্থ আসে গবেষণা, শিক্ষার্থীদের বেতন, পাবলিশিং সার্ভিস, এলামনাইদের অনুদান এবং অন্যান্য খাত থেকে। আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি যে, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ রয়টার্সের একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, "ক্যামব্রিজের সেন্ট ক্যাথরিন কলেজের এলামনাস ডেভিড হার্ডিং তাঁর নিজের এবং স্ত্রী ক্লডিয়া হার্ডিংয়ের যৌথ ফাউন্ডেশন 'ডেভিড অ্যান্ড ক্লডিয়া হার্ডিং ফাউন্ডেশন' থেকে ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডের (প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা) রেকর্ড পরিমাণ অনুদান দিয়েছেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে।"

আমাদের দেশে গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে অনেকগুলি সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ১৬ কোটি মানুষের একটি দেশে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই। বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ের কথা বাদই দিলাম, দক্ষিণ এশীয় তালিকায়ও বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নেই।

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন নাগরিক হিসেবে কল্পনা করি দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে একটি করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়! এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছয়টি করে ফ্যাকাল্টি থাকবে: (ক) ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, (খ) ফ্যাকাল্টি অব আর্টস,

(গ) ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং, (ঘ) ফ্যাকাল্টি অব কমার্স, (ঙ) ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন ও (চ) ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা হবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক একজন স্কলার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্থমাউথ-এর প্রভোস্ট এবং নির্বাহী ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ আতাউল করিম কিংবা পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে থাকা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহিদ হাসানের নাম। এরকম অনেক বাংলাদেশি স্কলার পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুতিশীল যোগ্য ব্যক্তিরাই হবেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পাশাপাশি ভিন্ন দেশের যোগ্যতাসম্পন্ন স্কলারদেরও উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

যাচাই করে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দান করা হবে। সব ধরনের প্রমোশনের জন্য বিগত তিন বছরের কর্মই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পৃথক একটি বেতন স্কেল থাকবে।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে পারবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যে কোনো দেশের নাগরিক। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর যে কোনো পর্যায়ে ছাত্র ভর্তির আবেদনের জন্য একটি ন্যূনতম গ্রেড থাকবে। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে SAT, GMAT কিংবা GRE-র অনুরূপ কোনো পরীক্ষার স্কোর, রিকমেনডেশন লেটার, এবং আনুষঙ্গিক ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। SAT, GMAT কিংবা GRE-র অনুরূপ

যে কোনো ফ্যাকাল্টির অধীনে একটি বিভাগ খোলার জন্য সবার প্রথমে অন্তত বিশজন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এক বছর সময় পাবেন সিলেবাস এবং আনুষঙ্গিক ল্যাব তৈরি করতে। প্রথম সেমিস্টারে ছাত্র ভর্তির আগে এসব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। যে কোনো বিভাগের একটি ক্লাসের একটি সেকশনে চল্লিশ জনের বেশি ছাত্র থাকতে পারবে না। স্নাতক পর্যায়ের ক্লাস হবে সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পিএইচডি ডিগ্রি, সঙ্গে বিদেশের কোনো শিক্ষা কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দু বছর কাজের অভিজ্ঞতা। একজন শিক্ষক পৃথিবীর যে কোনো দেশের নাগরিক হতে পারবেন, তবে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে এই মহূর্তে কর্মরত কোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন না। আইনগতভাবে সম্ভব না হলেও অন্তত অলিখিতভাবে বৃহত্তর স্বার্থে এই চর্চা করতে হবে। ১৬ কোটি মানুষের দেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কোনোভাবেই যেন ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা অবহেলার শিকার না হয় তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক এসব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন থেকে দেশের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত নিয়মকানুনের সাথে তাঁদের অভ্যস্ততা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঘাত ঘটাবে। নতুন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে কোনো বাংলাদেশি আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষকদের টিচিং লোড থাকবে ৪০%, গবেষণা লোড ৬০%। গবেষণার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অন্তত দুজন ফুল ফান্ডেড পিএইচডি ছাত্র এবং একজন পোস্টডক্টরাল ফেলো থাকবে। প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এরপর কর্মদক্ষতা

একটি ভর্তি পরীক্ষা প্রণয়ন খুব কঠিন কাজ নয়। তবে কোনোভাবেই এখনকার মতো ভর্তি পরীক্ষা থাকবে না।

যে কোনো ফ্যাকাল্টির অধীনে একটি বিভাগ খোলার জন্য সবার প্রথমে অন্তত বিশজন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এক বছর সময় পাবেন সিলেবাস এবং আনুষঙ্গিক ল্যাব তৈরি করতে। প্রথম সেমিস্টারে ছাত্র ভর্তির আগে এসব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। যে কোনো বিভাগের একটি ক্লাসের একটি সেকশনে চল্লিশ জনের বেশি ছাত্র থাকতে পারবে না। স্নাতক পর্যায়ের ক্লাস হবে সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ক্লাস দুইটার পরে হতে পারে। লাইব্রেরি এবং গবেষণা ল্যাব প্রায় সার্বক্ষণিক খোলা থাকবে। রিফ্রেশমেন্ট বিরতির জন্য সকাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ক্লাস, পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। স্নাতক ক্লাসে একজন শিক্ষকের সাথে থাকবে একজন টিচিং/গবেষণা সহকারী এবং একজন সহযোগী। টিচিং সহযোগীর প্রধান কাজ হবে ছাত্রদের গ্রেডিং করা। টিচিং সহকারী হবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক লেভেলের ছাত্র, সহযোগী হবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র (প্রথম কয়েক সেমিস্টার ব্যতিক্রম)।

অনেকেই জেনে অবাক হবেন যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ২৭% আয় ছিল গবেষণা অনুদান এবং কন্ট্রাক্ট থেকে। পৃথিবীর সব সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একই চিত্র অর্থাৎ গবেষণাই আয়ের সর্বোচ্চ উৎস। একটি কথা মনে রাখা উচিত, আমাদের ছাত্ররা বিদেশের উন্নত গবেষণা পরিবেশে শুধু ভালো গবেষণাই করেন না, নভেল আইডিয়া সৃষ্টি করে সামনে থেকে নেতৃত্বও দেন। সুতরাং শুরুতেই যেন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একটি উন্নত গবেষণা সংস্কৃতি গড়ে উঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কেন্দ্রিয়ভাবে বৃহত্তর স্কেলে অন্তত একটি 'অ্যাডভান্সড গবেষণা ল্যাবরেটরি' যেখানে থাকবে মানসম্মত গবেষণার জন্য সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও থাকবে সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আধুনিক লাইব্রেরি, উন্নত হেলথ ক্লাব, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, সুইমিং পুল, বড় মাঠ এবং সুউচ্চ টাওয়ার। সকল ধরনের সমাবেশের জন্য থাকবে একটি স্কয়ার। অনুমতিসাপেক্ষে যে কোনো অনুষ্ঠান, যে কোনো প্রতিবাদ শুধু ঐ স্কয়ারে নির্দিষ্ট সময়ে করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে একটি আধুনিক কনফারেন্স সেন্টার, সাথে ফাইভ স্টার হোটেলের মানের একটি গেস্ট হাউজ। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষণাক্ষেত্রে আয়োজিত কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে আগত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত ফি প্রদান করে ঐ গেস্ট হাউজে থাকতে পারবেন। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস রুম, অফিস রুম, বাথরুম সব কিছুতেই অপরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ার মতো। নতুন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস রুম থেকে বাথরুম পর্যন্ত সবকিছু থাকবে চকচকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ছাত্রদের আবাসিক হল থাকবে। তবে ঐসব হলে শুধু প্রথম বর্ষের ছাত্ররা থাকতে পারবে। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে আবাসিক হলে কোনো ছাত্র থাকতে পারবে না। প্রথম বর্ষের ছাত্ররা সম্পূর্ণ নতুন একটি শহরে আসার পর স্বভাবতই থাকা-খাওয়ার জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে অনেক ভালো ছাত্র পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, হতাশাগ্রস্ত হয়। নির্ধারিত সময়ে তারা ডিগ্রি অর্জন করতে পারে না বিধায় অতিরিক্ত সময় আবাসিক হলে অবস্থান করে এবং হল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথম বর্ষে কতজন ছাত্র ভর্তি হবে ঐ হিসেব করেই আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রথম বর্ষের পরে ছাত্ররা নিজ দায়িত্বে শহরে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে।

নতুন এই আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কিছুই ফ্রি প্রদান করা হবে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব আয় ঈর্ষণীয়। আয়ের আরও একটি বড় উৎস শিক্ষার্থীদের বেতন। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের ১৫ শতাংশ এসেছিলো শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে। কাজেই

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্র, যোগাযোগ এবং গার্মেন্টস শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের ক্রিকেট হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের। অথচ উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় আমরা উন্নত দেশের চেয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হলে আপাতদৃষ্টিতে এরকম অসম্ভব কিছুকে বাস্তব এবং সম্ভব করতে হবে।

বাংলাদেশের নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের একটি যৌক্তিক ফি অবশ্যই প্রদান করতে হবে। এটি অসম্ভব কিংবা অবাস্তব নয়। কেননা বর্তমানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের হাজার হাজার ছাত্র উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফি প্রদান করে পড়ছে। বাংলাদেশের আর্থিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে দেশীয় ছাত্রদের জন্য যে ফি নির্ধারণ করা হবে, বিদেশি ছাত্রদের জন্য তা অন্তত দুই থেকে তিনগুণ বেশি হবে। তবে ভর্তির জন্য বিবেচিত বাংলাদেশি কোনো ছাত্রের পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা থাকলে ঐ ছাত্র ঋণ পাবে। পাস করার পর ধাপে ধাপে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধের জন্য একটি যৌক্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। পাশাপাশি টিচিং/গবেষণা সহকারী এবং সহযোগী হিসেবে সম্ভব সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতে করে ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় পক্ষই যথেষ্ট লাভবান হবে।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্র, যোগাযোগ এবং গার্মেন্টস শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের ক্রিকেট হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের। অথচ উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় আমরা উন্নত দেশের চেয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হলে আপাতদৃষ্টিতে এরকম অসম্ভব কিছুকে বাস্তব এবং সম্ভব করতে হবে। সত্যিকার মানের গর্ব করার মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শতবর্ষ পরে ডেভিড হার্ডিং-এর মতো এলামনাইদের অনুদান হয়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের অন্যতম একটি বড় উৎস। মনে রাখতে হবে শুধু শিক্ষা এবং গবেষণায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারলে এই স্রোতেই আরও অনেক কিছু আন্তর্জাতিক মানের হয়ে যাবে। এই তত্ত্ব ইউরোপ আমেরিকার কথা বাদ দিলাম, এশিয়ার কিছু দেশেই প্রমাণিত। কিন্তু এই সহজ তত্ত্বটি আমরা এখনো কেন উপলব্ধি করতে পারছি না!

লেখক: অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বুয়েট।
Email: m.basith75@gmail.com

মানসম্মত শিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানার্জন

আলমগীর খান

স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য শিশু-কিশোর প্রজন্মের মাঝে জ্ঞানের বিস্তার। যদিও নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সনদপত্র দেয়ার বিধান আছে, সনদপত্রটা মূল উদ্দেশ্য না। মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত জ্ঞানের প্রসার। তবে স্কুল-কলেজ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়, তা হলো প্রকৃত জ্ঞানকে পিছনে ফেলে সনদপত্রের মুখ্য হয়ে ওঠা। ঝকঝকে ও চকচকে সনদপত্র প্রদান ও অর্জন হয়ে ওঠে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনেকের ক্ষেত্রে ব্যবসাও। কিন্তু সনদপত্র সবসময় প্রকৃত জ্ঞানের প্রমাণ নয়। ভুয়া জ্ঞানের জন্যও সনদপত্র লাভ করে প্রকৃত জ্ঞানকে সরিয়ে দিয়ে সমাজে আধিপত্য লাভ করা যায়। যা কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

একটা কৌতুক প্রচলিত আছে আলবার্ট আইনস্টাইন ও তার গাড়ির চালককে নিয়ে। বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের সামনে তিনি যে আপেক্ষিক তত্ত্ব বর্ণনা করতেন তা শুনে শুনে তার গাড়িচালকেরও তা মুখস্থ হয়ে যায়। একদিন আইনস্টাইনের সম্মতিক্রমে তার গাড়িচালকই এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। কিন্তু যখন দর্শকদের মাঝ থেকে একজন বিজ্ঞানী তাকে একটি প্রশ্ন করেন, সে এর উত্তর না জানায় চালাকি করে বলে যে, এ তো খুবই সহজ উত্তর যা আমার গাড়িচালকও জানে, আপনি বরং তাকেই জিজ্ঞেস করুন। গাড়িচালক বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃত আইনস্টাইনকে। গল্পটি ছোটবেলায় শুনেছিলাম আমার স্কুল চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন ইনস্টিটিউটের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা জাহানারা আপার কাছে।

কিন্তু সম্প্রতি জানলাম, একই গল্প পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও তার গাড়িচালককে নিয়ে প্রচলিত। দি আর্ট অব থিংকিং ক্লিয়ারলি বইতে রলফ ডোবেল এ কৌতুকটি উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা-গবেষক ও উন্নয়ন-চিন্তক শাহজাহান ভুঁইয়া তার অ্যান এডুকেশনাল অ্যাপ্রোচ টু ইনক্লুশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট বইতে (২০১৮র ডিসেম্বরে সিদীপ কর্তৃক প্রকাশিত) এ গল্পটি পুনরুল্লেখ করেছেন প্রকৃত জ্ঞানের সঙ্গে কৃত্রিম জ্ঞানের পার্থক্য বোঝাতে। প্রকৃত জ্ঞান গল্পের গাড়িচালকের জ্ঞান থেকে, তোতাপাখির মুখস্থ আউড়ানোর ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখক ভুঁইয়ার মতে 'প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষার্থীর মনকে আলোকিত করে যারা অন্যদের মনকেও একইরকমে আলোকিত করতে সক্ষম এবং যা মানুষকে আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে সক্ষম করে তোলে যা এই গ্রহে মানবতা বেঁচে থাকতে অপরিহার্য।'

প্রথমত অন্তর্ভুক্তির কথা ধরা যাক। যার অর্থ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সমাজের কোনো শিশু কোনো অজুহাতেই বাদ যাবে না। যে শিক্ষাব্যবস্থা বিত্ত, পেশা ও বংশের ভিত্তিতে সমাজের কিছু শিশুকে শিক্ষা দেয়, কিন্তু পারিবারিক জাতি-বর্ণ-পেশার পরিচয়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ও সর্বোপরি দারিদ্র্যের কারণে বহু শিশুকে শিক্ষার বাইরে রাখে তা নিঃসন্দেহে দোষী। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় কয়েক ধরনের শিশু সবসময় শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ ও অন্যায়। সমস্যাটি ঐ ধরনের শিশুর নয়, শিক্ষাব্যবস্থার। যেখানে প্রত্যেকে সমানভাবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় না, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানচর্চা সম্ভব না। অতএব এমন ব্যবস্থা তৈরি হওয়া প্রয়োজন যেখানে কোনো শিশু কোনো অজুহাতেই বাদ না পড়ে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্যে তৈরি হতে হবে। মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞানবিস্তার যা শিক্ষার্থীর মনকে এমনভাবে আলোকিত করবে যে তারাও অন্যদেরকে আলোকিত করতে পারবে এবং তারা আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্মে সক্ষম হয়ে উঠবে। যা মানবতার টিকে থাকা ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু শিক্ষা যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত না হয়, প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে না।

প্রথমত অন্তর্ভুক্তির কথা ধরা যাক। যার অর্থ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সমাজের কোনো শিশু কোনো অজুহাতেই বাদ যাবে না। যে শিক্ষাব্যবস্থা বিত্ত, পেশা ও বংশের ভিত্তিতে সমাজের কিছু

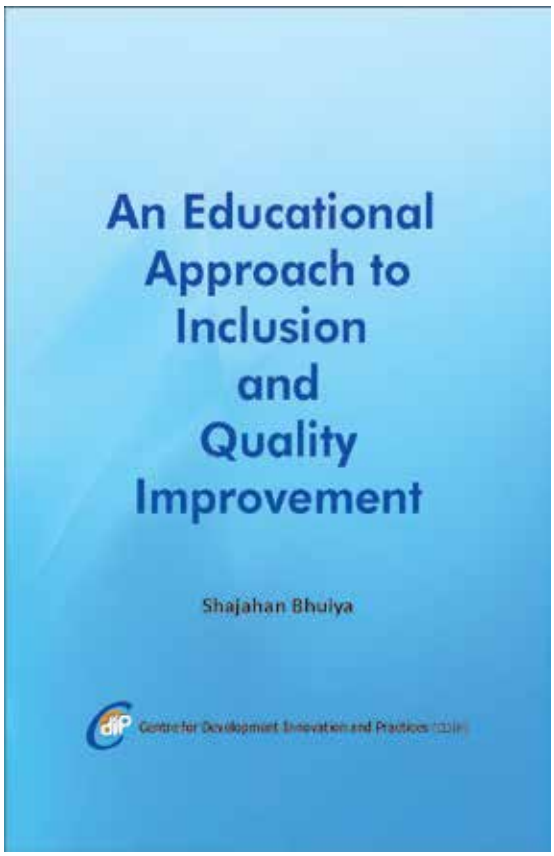

শিশুকে শিক্ষা দেয়, কিন্তু পারিবারিক জাতি-বর্ণ-পেশার পরিচয়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ও সর্বোপরি দারিদ্র্যের কারণে বহু শিশুকে শিক্ষার বাইরে রাখে তা নিঃসন্দেহে দোষী। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় কয়েক ধরনের শিশু সবসময় শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ ও অন্যায়। সমস্যাটি ঐ ধরনের শিশুর নয়, শিক্ষাব্যবস্থার। যেখানে প্রত্যেকে সমানভাবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় না, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানচর্চা সম্ভব না। অতএব এমন ব্যবস্থা তৈরি হওয়া প্রয়োজন যেখানে কোনো শিশু কোনো অজুহাতেই বাদ না পড়ে। তবেই শিশুর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হবে। না হয়, প্রতারণা হবে যারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে ও যারা বাদ পড়ছে উভয়ের সঙ্গে।

এরপর মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন। পণ্যের ক্ষেত্রে মানসম্মত কথাটা যত ভালভাবে খাটে, শিক্ষার সঙ্গে ততটা নয়। কারণ শিক্ষা তো সবসময় মানসম্মতই হতে হবে। গুণমান বাদ দিলে শিক্ষা কথাটার আর কোনো মানেই থাকে না। জ্ঞান প্রকৃতই হবে, অপ্রকৃত বা ভুয়া জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এখন শিক্ষার আগে এই বাড়তি মানসম্মত কথাটা জুড়ে দিতে হচ্ছে, কেননা শিক্ষা ও জ্ঞান বলে বাজারে অনেক কিছু চালু আছে ও আধিপত্য বিস্তার করেছে যা অপ্রকৃতই শুধু নয়, ক্ষতিকরও। অতএব, শিক্ষায় মানের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়ের সুযোগ নেই।

শাহজাহান ভুঁইয়া তার বইতে প্রকৃত শিক্ষার জন্য এই অন্তর্ভুক্তির ও মানের দিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানসম্মত শিক্ষার জন্য 'জগ ও মগ' শিখন পদ্ধতি অনেক আগেই অচল হয়ে গেছে। বলেছেন, 'শিশু নিষ্প্রাণ সত্ত্বা নয় যে, তাকে নির্দেশিত জ্ঞান, দক্ষতা বা অভ্যাস দিয়ে ভরাট করা যাবে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সম্পর্ক হতে হবে এক প্রাণের সঙ্গে আরেক প্রাণের, সপ্রাণের ও নিষ্প্রাণের নয়। সম্পর্কটা মানুষে মানুষে, মানুষে ও বস্তুতে নয়। জ্ঞান জগ থেকে মগে ঢেলে দেয়ার জিনিস নয়।'

জগ ও মগের শিখন পদ্ধতিতে কেবল গল্পে আইনস্টাইনের বা ম্যাক্স প্ল্যাংকের গাড়িচালক তৈরি হতে পারে যিনি কেবল না বুঝেই মুখস্থ আউড়ে যেতে পারেন। অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির যুগে যা সবচেয়ে প্রয়োজন। অতএব শিখন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার– দাতা ও গ্রহীতার নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে এর একটা চমৎকার ছবি এঁকেছেন: 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়– এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়। কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।'

অতএব শিক্ষা কলেছাঁটা জিনিসের মতো করে শিক্ষকরূপী জগ হতে শিক্ষর্থীরূপী মগে ঢেলে দেয়া যায় না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভযকে প্রাণময় হতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও শিখন পদ্ধতি এই প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক হতে হবে। এজন্য ভীতি, শাস্তি, অপমান, ব্যর্থতার গ্লানি, আনন্দহীনতা ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্য এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ দূর হতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ও শিখন প্রক্রিয়া হতে হবে প্রত্যেক শিশুর জন্য আনন্দদায়ক ও সৃষ্টিশীল। তবেই কেউ বাদ পড়বে না ও মানসম্মত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব হবে। হবে প্রকৃত জ্ঞানার্জন।

হাতে-কলমে শিক্ষা

আশরাফ আহমেদ

সম্পাদক শামসুল আলম তুষার টেক্সট মেসেজ করে জানালো ডুবানা ম্যাগাজিনের জন্য একটি লেখা চাই। বলেছিলাম, ওকে নিরাশ করবো না। পরের প্রশ্নের উত্তরে জানালো, বিষয়টি হতে হবে প্রাণরসায়ন বিভাগের টাচি (Touchy) কোন স্মৃতিচারণ।

কিন্তু গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে চারণ করে করে আমি যে স্মৃতিভূমি বিরান করে ফেলেছি! আমার সব স্মৃতি যে লোপ পেয়েছে! অবশিষ্ট যা আছে তার সবই হচ্ছে স্মৃতিভ্রম। তার ওপর আমার স্বল্প ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী ইংরেজি টাচি শব্দের মানে হতে পারে 'স্পর্শ-সম্পর্কিত' অথবা 'স্পর্শ-কাতর'। এদেশে এমনকি বাংলাদেশে ইদানিং শিশুদের যেভাবে 'স্পর্শ-সম্পর্কিত' জ্ঞানদান করা হচ্ছে তাতে এ সম্পর্কে লেখার কোনো সাহস পাই না। আর আজকাল বাংলায় স্পর্শ-কাতর বিষয় তো হচ্ছে ধর্ম নিয়ে কিছু কথা বলা– মহা বিপজ্জনক ব্যাপার! বেশ মুশকিলে পড়েছি তো! কী নিয়ে লিখি? তবে একটি উপায় আছে। আর কিছু না হোক 'স্পর্শ' শব্দটি ব্যবহার করে কিছু লিখলেই তো হয়।

স্মৃতিভূমিতে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। উ-হু! লেখার মত কিছুই দেখা দিচ্ছে না। আচ্ছা পঞ্চাশ বছর আগে ক্লাশে কী শিখেছিলাম তাই লিখে দেই না কেন? তখন যাদের জন্মও হয় নাই তাদের জন্য পঞ্চাশ বছর আগে ক্লাশে কী এবং কীভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল তার কিছুটা উদাহরণ লেখা হয়েই থেকে যাক না! এখনকার ছেলেমেয়েরা আমার সহপাঠীদের কাউকে না চিনুক, কোনো কোনো শিক্ষকের কথা নিশ্চয়ই মনে রাখবে।

হ্যাঁ, তাই করবো। লেখাটির শিরোনাম হতে পারে 'শিক্ষকের স্পর্শে আসা ছাত্র' অথবা 'রাসায়নিক পদার্থের স্পর্শে মানুষ'। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে কী শিখেছিলাম তা-ই লিখবো। তবে সব না। একদিনের একটি ক্লাশের কথা। প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশ। ১৯৭০ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়।

আমাদের তিন বছরের সিনিয়র সৈয়দ সালেহীন কাদরী মাত্র শিক্ষক হয়ে ক্লাশ নিচ্ছেন। প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশে হাতে-কলমে শিখাতে যাচ্ছেন একটি দ্রবণে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ মাপার পরীক্ষা-পদ্ধতি। পদ্ধতিটির সব কিছু এখন আর মনে নেই, তবে ভিটামিনটির দ্রবণে সামান্য একটু এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইডের দ্রবণ মেশানোর দশ বা কুড়ি সেকেন্ডের মাঝে একটি ফটোমিটারে এবসরবেন্সের রিডিং নিতে হতো। এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইডের দ্রবণটি বানানো ছিল সম্ভবত ১২ নর্মাল হাইড্রোক্লোরিক এসিডে। এটি ব্যবহারের ব্যাপারে সালেহীন ভাই বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন।

চার বা পাঁচজনের দলে বিভক্ত হয়ে আমরা ক্লাশ করছিলাম। ভ্রমসিক্ত স্মৃতি বলছে, আমার দলে ছিল রত্নভূষণ সাহা-মণ্ডল, জাকেরা খানম চৌধুরী, আসিয়া জাফরি, আবদুর রহমান, এবং সম্ভবত নূরুল আবসার চৌধুরী। তৃতীয় তলার ল্যাবে সম্ভবত কোন সবুজ বা হলুদ সব্জি অথবা ফল হামান-দিস্তায় পিষে এবং কাগজের ছাঁকনি বা ফিল্টার পেপারে ছেঁকে ভিটামিন-এ'র দ্রবণ বানিয়েছিলাম। আজকের দিনে হলে কাজটি হয়তো আধা ঘণ্টার মাঝেই সম্পন্ন করে ফেলতাম। কিন্তু তখন তো সবাই ছিলাম প্রস্ফুটনোন্মুখ বিজ্ঞানী। কাজেই সময় লেগেছিল আড়াই-তিন ঘণ্টা। কেউ কেউ নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ করে ফেলেছিল। আবার ভিটামিন আহরণ বা এক্সট্রাক্সন না করেই কেউ কেউ ফল এবং সব্জিগুলো খেয়েই হয়তো শেষ করে ফেলেছিল। ক্লাশের সময় শেষ। প্রায় সবাই বাড়ি চলে গেছে। সালেহীন ভাইও চলে গেছেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত নিবেদিত জ্ঞানার্থী শেষ মাপটি না নিয়ে কিছুতেই বাড়ি ফিরবো না।

তিনতলার কাজ শেষ হলে সদলবলে চললাম দোতলায়। আমার হাতে আহরিত ভিটামিন-এ'র বোতল। আরেক জনের হাতে কয়েকটি কিউভেট। একজনের হাতে দুটি কাচের পাইপেট ও একটি রাবারের পাইপেট-ফিল্টার। একজনের হাতে খাতা-কলম, আর জাকেরা খানম চৌধুরীর হাতে একটি টেস্ট-টিউবে এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড।

এখনকার চেয়ারম্যানের রুমে ঢোকার আগে করিডোরের বাঁ পাশে ছিল তালাবদ্ধ ও শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র-ঘর বা ইন্সট্রুমেন্ট-রুম। সেই ঘরে থাকতো দামী ও সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি। শীতের সন্ধ্যা, চেয়ারম্যানের রুম তো বটেই করিডোরের ত্রি-সীমানায়ও কেউ নেই। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে। দলের সবাই তাড়া দিচ্ছে তাড়াতাড়ি পরীক্ষাটি শেষ করতে হবে। অন্ধকার ঘরের তালাটি খুলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। সুইচ টিপে আলো জ্বালালেও অনেক যন্ত্রের ভিড়ে আলোআঁধারি একটি ভাব থেকেই গেল। গা ছমছম করছে।

ছোট্ট প্রায় চৌকোনা কোলম্যান ফটোমিটারটি অন করে একটি পাইপেটে মুখ লাগিয়ে ভিটামিনের দ্রবণটি তুলে নিলাম ও একটি একটি করে কয়েকটি কিউভেটে ঢাললাম। একজন রাবার পাইপেট-ফিল্টারটি অপর কাচের পাইপেটে লাগিয়ে দিল। তা দিয়ে আমি জাকেরার হাতে ধরা টেস্ট-টিউব থেকে এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড মেপে তুলে আমার হাতে ধরা কিউভেটে ঢালছিলাম। স্টপ-ওয়াচে চোখ রেখে কিউভেটটি ফটোমিটারে ঢুকিয়ে এবসরবেন্সের রিডিং নিচ্ছিলাম। আমার মুখে উচ্চারিত সংখ্যাটি অন্য এক সাথী খাতায় টুকে নিচ্ছিল।

পরের রিডিংয়ের জন্য আমি আবার জাকেরার হাতে ধরা টিউব থেকে এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড তুলে নিতে গেলে সে বললো

সাবধানে কাজ করুন, আপনি তো বার বার রিএজেন্টটি আমার হাতে ফেলছেন!

কুড়ি সেকেন্ডের মাঝে রিডিং না নিলে পরীক্ষাটি মাটি হয়ে যাবে না? তার ওপর রাত হয়ে যাচ্ছে, সবার মত আমারও হলে ফেরার তাড়া। আমার কি তখন এসব ছোটখাট সমস্যায় কান দিলে চলে? বললাম আমি কী করবো, রাবারের পাইপেট-ফিল্টারটি নষ্ট আর আমি তো পাইপেটটি মুখে লাগিয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যুক্ত এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড তুলতে পারি না! তবে সালেহীন ভাই কিন্তু বলে দিয়েছিলেন, রিএজেন্টটি খুব খারাপ (করোসিভ), কোনভাবেই যেন চামড়া স্পর্শ না করে। আপনি শীঘ্রই হাতটি ধুয়ে ফেলুন। এই বলেই আমি ফটোমিটারের রিডিং নেয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম।

ভিটামিন-এ'র দ্রবণের কয়েকটি ঘনত্ব বা ডাইলিউশনের প্রতিটির তিনটি করে রিডিং নিচ্ছিলাম। প্রতিবার এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড নিতে গেলে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাতে ফোঁটা পড়তে থাকায় উৎকণ্ঠা নিয়ে জাকেরার প্রতিবাদ-কণ্ঠের তেজ বাড়তে লাগলো।

এবার সে বললো, আমার হাত খুব জ্বলছে। আমিও চট করে আগের মতোই বললাম, তাড়াতাড়ি হাতটি ধুয়ে ফেলুন। এক পর্যায়ে হঠাৎ করে জাকেরার চিৎকার প্রচণ্ড ও তীব্র হয়ে উঠলো। আমরা সবাই থমকে দাঁড়ালাম। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে কারো কষ্ট হলো না যে, চিৎকারটি ছিল ওর আয়ত্তের বাইরে! নিস্তব্ধ তিন তলা বিল্ডিংয়ের সর্বত্র সেই চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে কেঁপে কেঁপে ফিরে এলো। পরক্ষণেই সিঁড়িতে এবং করিডোরে দুপদাপ শব্দ পেলাম। তিন তলার অফিসে উপস্থিত বিশালদেহী পারভেজ আহমাদ স্যার, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। প্রায়ান্ধকার ঘরে জাকেরার হাতটি আলোর সামনে তুলে ধরে বললেন, এ কী করে হলো? হাতে কী ফেলেছো?

বেদনা ও যন্ত্রণায় চিৎকার-রত জাকেরার হয়ে আরেকজন উত্তর দিল, এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড। জাকেরার বিরামহীন চিৎকার-গোঙানিকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে গলাটি বের করে পারভেজ স্যার আরো জোরে চিৎকার করে ডাকলেন– সন্তোষ, আবু তালেব, কে কোথায় আছো, এদিকে এসো। এরপর তিনি জাকেরার হাতটি বেসিনের কল ছেড়ে পানির নিচে ধরে রাখলেন। অন্যদিকে মরিয়া হয়ে অন্যদের নিয়ে আমি তখনো তাড়াতাড়ি পরীক্ষাটি শেষ করতে মগ্ন হয়ে আছি!

ল্যাবের বেয়ারার সন্তোষদা হন্তদন্ত হয়ে দেখা দিলেন। পারভেজ স্যার বললেন, ইডিটিএ (EDTA) আছে? উত্তর শোনার আগেই বললেন, ল্যাবে না থাকলে স্টোর থেকে এক্ষুনি নিয়ে এসো, আর বড় একটি বীকার। কলের পানির নিচে জাকেরার হাতটি রেখে এবার স্যার জানতে চাইলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত কীভাবে ও কেন এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইডে হাতটি ভিজলো? সবার দৃষ্টি তখন আমার দিকে নিবদ্ধ। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় না নিয়েও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বললাম, রাবারের পাইপেট-ফিল্টারটিতে ভালো নিম্নচাপ বা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হচ্ছিল না। ফলে পাইপেটটিতে যে এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইড উঠে আসছিল তা নিজ থেকেই ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ছিল। তার ওপর কুড়ি সেকেন্ডের মাঝে রিডিং নিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করতে গিয়ে আমি ওর হাতে ফোঁটা পড়াটি থামাতে পারিনি। নিজেকে বাঁচাবার মত সম্পূর্ণ যৌক্তিক একটি উত্তর দিলেও কষ্টে কুঁকড়ে যাওয়া জাকেরার চেহারা দেখে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো।

প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন পারভেজ স্যার সুগন্ধি-রসায়ন ক্লাশে বেনজিন-এর বিক্রিয়ার ওপর একটি বাড়ির কাজ দিয়েছিলেন। অনেক খেটেখুটে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে বেনজিন-এর সব ধরনের বিক্রিয়াকে শ্রেণিবদ্ধ ও একত্র করে একটি রঙিন ছক বা চার্ট বানিয়েছিলাম। স্যারের এটি খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তিনি সর্বোচ্চ নম্বর দিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি আমাকে প্রশংসা ও স্নেহের চোখে দেখতেন। সম্ভবত সেই কারণে আজ বকাঝকা না করে জাকেরার হাতের শুশ্রুষায় মনোযোগ দিলেন। ততক্ষণে ভিটামিন-এ মাপার পরীক্ষাটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি স্যার এবং জাকেরার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

বীকার এবং একটি বিশাল বোতল হাতে সন্তোষদা ফিরে এলে বেশি আলোর জন্য স্যার জাকেরাকে নিয়ে করিডোরে চলে এলেন। পিছু পিছু আমি ও অন্যরা। এতক্ষণের মাঝে এইবার আমি জাকেরার হাতের দিকে ভালো করে তাকালাম। ওর বাম হাতের তর্জনি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগ এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখতে ভীষণ শক্ত-খসখসে ও সাদা হয়ে প্রায় দুই-তিন মিলিমিটার উঁচু হয়ে আছে। দেখতেই শরীরে এক বিজাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হলো।

জাকেরার গোঙানি থামছে না কিছুতেই। স্যার বীকারে পানি ঢেলে তড়িৎ গতিতে বোতল থেকে ঝলাৎ করে অনেকটা ইডিটিএ ঢেলে একটি কাচের দণ্ড দিয়ে নাড়লেন। সাদা পদার্থটি পুরোপুরি দ্রবীভূত হওয়ার আগেই তাতে জাকেরার হাতটি চুবিয়ে দিলেন। হঠাৎ কী মনে হতে সন্তোষদার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের বোতল নিয়ে এসো।

সেটি এলে আগের মতোই আরেকটি বীকারের পানিতে তা ঢেলে দ্রবণ বানালেন। ততক্ষণে জাকেরার গোঙানির তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছিল। স্যার ওকে বললেন, ধৈর্য ধরো, ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার ওর হাতটি আগের ইডিটিএ-বীকার থেকে তুলে বাইকার্বোনেট-বীকারে চুবিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ওর হাতটি তিনি আবার ইডিটিএ-বীকারে স্থানান্তর করলেন।

জাকেরার গোঙানি আরো কমার সাথে সাথে আমার অপরাধবোধও কমে এলো। সাহস নিয়ে অনুগত ছাত্রের মত এবার জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আপনি ওর হাতটি এক বীকার ছেড়ে আরেক বীকারে কেন চুবাচ্ছেন, আর তাতে ওর চিৎকার কমছে কীভাবে?

তিনি বললেন, শোনো, তোমরা যে পরীক্ষাটি করছো তা অতি বিপজ্জনক। আমি হলে এই পরীক্ষাটি তোমাদের করতেই দিতাম না। যাই হোক, প্রথমত ১২ নর্মালের মত ঘন হাইড্রোক্লোরিক এসিড কিছুক্ষণ চামড়ার স্পর্শে থাকলেই চামড়া ভেদ করে শরীরে

এবার সে বললো, আমার হাত খুব জ্বলছে। আমিও চট করে আগের মতোই বললাম, তাড়াতাড়ি হাতটি ধুয়ে ফেলুন। এক পর্যায়ে হঠাৎ করে জাকেরার চিৎকার প্রচণ্ড ও তীব্র হয়ে উঠলো। আমরা সবাই থমকে দাঁড়ালাম। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে কারো কষ্ট হলো না যে, চিৎকারটি ছিল ওর আয়ত্তের বাইরে! নিস্তব্ধ তিন তলা বিল্ডিংয়ের সর্বত্র সেই চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে কেঁপে কেঁপে ফিরে এলো। পরক্ষণেই সিঁড়িতে এবং করিডোরে দুপদাপ শব্দ পেলাম। তিন তলার অফিসে উপস্থিত বিশালদেহী পারভেজ আহমাদ স্যার, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। প্রায়ান্ধকার ঘরে জাকেরার হাতটি আলোর সামনে তুলে ধরে বললেন, এ কী করে হলো? হাতে কী ফেলেছো?

ঢুকে যায়। তার ওপর এন্টিমনি হচ্ছে একটি ভারি ধাতব-পদার্থ বা হেভি মেটাল। ভারি ধাতব-পদার্থ খুব সহজেই আমিষের সিস্টেইন এমাইনো এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে। জাকেরার হাতের আঙুল অনেকক্ষণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংস্পর্শে থাকার ফলে চামড়ায় যে ক্ষত হয়েছে তা দিয়ে এন্টিমনি ওর হাতের আমিষের সাথে বিক্রিয়া করেছে। সাদা হয়ে ফুলে ওঠা ওর হাত তারই প্রমাণ।

স্যার বলে চললেন, ওর হাতে আছে স্নায়ুতন্ত্রের অনেক শাখা প্রশাখা। স্নায়ু-শাখার ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে হাত জখম হওয়ার সংবাদটি নিমেষেই পৌঁছে যাচ্ছে। আর তাতেই, না চাইলেও সে চিৎকার করে উঠছে। আরো অনেকক্ষণ যদি হাতটি এন্টিমনি পেন্টাক্লোরাইডের সংস্পর্শে থাকতো তবে তা ওর রক্তধারাতেও পৌঁছে যেতে পারতো, এবং সেটি হতো খুবই বিপজ্জনক। আল্লাহর রহমতে মনে হচ্ছে সেরকম কিছু হয়নি।

আমি বললাম, কিন্তু আপনি ওর হাতটি ইডিটিএ-তে চুবালেন কেন?

স্যার বললেন, সিস্টেইন এমাইনো এসিডটি এন্টিমনি-কে যত ভালোবাসে (আফিনিটি) তারচেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে ইডিটিএ-কে। সিইস্টেইন-যুক্ত আমিষকে এন্টিমনি টানছে বলেই ওর হাতটি ফুলে উঠছে। বাট ইডিটিএ ইস আ স্ট্রং কিলেটার (But EDTA is a strong chelator)– কিন্তু ইডিটিএ খুবই শক্তিশালী একটি আকর্ষক। সেইজন্য হাতটি চুবানোর সাথে সাথে ইডিটিএ প্রোটিনের গায়ে লেগে থাকা এন্টিমনিকে আকর্ষণ করে টেনে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাতেই ওর হাতের আঙুলের ফোলাটি কমে আসছে।

কিন্তু আপনি ওর হাতটি আবার সোডিয়াম বাইকার্বোনেটে চুবাচ্ছেন কেন?

ওহ হ্যাঁ, আমি যে ইডিটিএ ব্যবহার করছি সেটি হচ্ছে টেট্রা-সোডিয়াম-ইডিটিএ। এটি পানিতে দ্রবীভূত হলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার তৈরি করে। ওর হাত এতক্ষণ ছিল হাইড্রোক্লোরিক এসিডে সিক্ত। টেট্রা-সোডিয়াম-ইডিটিএ এবং পানির বিক্রিয়া থেকে বাড়তি পাওয়া এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষারটি তাই ভালো একটি কাজ করছে– হাতে লেগে থাকা হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে নিরপেক্ষ লবণ বানিয়ে ফেলছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে চুবিয়ে রাখলে চামড়ার অন্য ধরনের ক্ষতি হতে পারে– চামড়ার আমিষকে দ্রবীভূত করে ফেলতে পারে। সোডিয়াম বাইকার্বোনেট একটি দুর্বল এসিড, পানিতে এটি কার্বোনেট-বাইকার্বোনেট বাফারও তৈরি করে। তাছাড়া বাইকার্বোনেট আমাদের রক্তের ও দেহকোষেরও অন্তর্গত। এটি দুর্বল হলেও ওর হাতে লেগে থাকা হাইড্রোক্সাইডকে ধ্বংস করতে পারে। ফলে হাতের চামড়াটি হাইড্রোক্সাইডজনিত ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকছে বলে আমার ধারণা।

আমাদের এই ছাত্র-শিক্ষক কথোপকথনের মাঝেমাঝে স্যার জাকেরার হাতটি এক থেকে আরেক বীকারে স্থানান্তর করে চলছিলেন। জাকেরার যন্ত্রণা-কাতরতার শব্দ এক সময় আর শোনা গেল না। ওর দুই আঙুল ও আশেপাশের চামড়ার ফোলা পুরোপুরি চলে গেলেও সাদা হয়ে যাওয়া খসখসে ভাবটি রয়েই গেল। কিন্তু ইডিটিএ এবং বাইকার্বোনেট ওর যন্ত্রণা-অনুযোগ-অভিযোগকে পুরোপুরি শুষে নিল। ও ঘরে ফিরতে চাইলো। স্যার বললেন, পরে প্রয়োজন মনে করলে হাসপাতালে চলে যেও, কিন্তু আমি যা করেছি এর বাইরে ওরা খুব বেশি করতে পারবে বলে মনে হয় না।

স্যার যা-যা বলে যাচ্ছিলেন তা টুকে নেয়ার প্রয়োজনে আমি সহপাঠীর হাত থেকে খাতাটি টেনে নিলাম। পকেট থেকে কলম বের করে যতটুক পারি তাই লিখে নিচ্ছিলাম।

সেদিন পরীক্ষা-বিভ্রাটটি জাকেরার হাতে না ঘটলে আর কলমে তা না লিখলে আমার হাতে-কলমে শিক্ষাটি অপূর্ণ থেকে যেতো!

সূর্য ততক্ষণে অস্তাচলে ঠাঁই নিয়েছিল।

[মজার ব্যাপার হলো এই যে, গবেষণা এবং জীবনের এই শেষ পর্বে এসে আমি কাকতালীয়ভাবে ভারি ধাতব পদার্থের সাথে আমিষের বিক্রিয়া নিয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি ও করছি। প্লেটো-এরিস্টোটলের বিখ্যাত কথোপকথনের মত করিডোরে

দাঁড়িয়ে ধার্মিক পারভেজ স্যারের সাথে সেদিনের কথাগুলো খুব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, যখনই ইডিটিএ-র বোতলটি বা মার্কারি, লেড, এন্টিমনি, মলিবডেনাম, আয়রন বা জিংক-এর বোতলটি হাতে নেই বা কাউকে এসবের ব্যবহারটি বুঝিয়ে দেই। ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান পারভেজ আহমাদ স্যার কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ডোক্রিনোলজিতে গবেষণালব্ধ এমএস ডিগ্রি নিয়ে আমাদের পড়াচ্ছিলেন। স্বাধীনতার পর পিএইচডি করার জন্য আবার কানাডায় ফিরে যান। চেষ্টা করেও আর যোগাযোগ করতে পারিনি। এক বা দুই বছর আগে সৈয়দ সালেহীন কাদরী প্রাণরসায়ন ও অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকতা থেকে অবসরে গেছেন। জাকেরা খানম চৌধুরী আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টন শহরে বাস করেন স্বামী-কন্যা সহ। ওঁর হাতে এখনো ভিটামিন-এ বা এন্টিমনি-র দাগটি আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হয়নি। বহুদিন থেকে ভারতীয় নাগরিক হয়ে রত্নভূষণ সাহা-মণ্ডল বোম্বেতে থাকতো শুনেছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে নুরুল আবসার চৌধুরী চট্টগ্রামের কোন এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিল এক বছর আগে পর্যন্ত। ছাত্রত্ব শেষের আগে থেকেই আসিয়া জাফরি এবং আবদুর রহমানের খোঁজ যোগাযোগ থাকা আমাদের সহপাঠীদের কেউ জানে না।]

পটোম্যাক, মেরিল্যান্ড
১৯শে এপ্রিল ২০১৯

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত

ফিরে দেখা

মিঠুন দেব

এক্সিকিউটিভ অফিসার, এমআইএস বিভাগ, সিদীপ

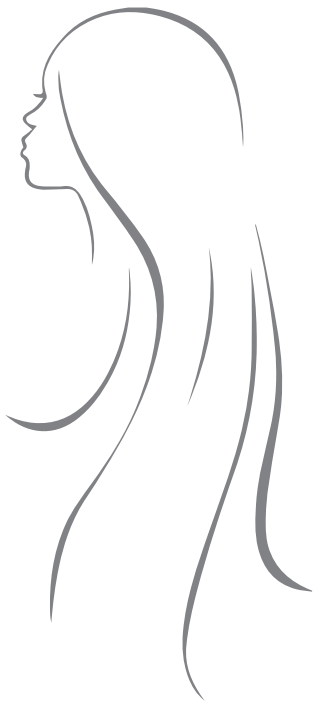

নারী তুমি আর কত অজানা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে?
নারী তুমি আর কত লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবে!
নারী তোমার আর কত অশ্রু সমলয়ে নীরবে ঝরবে?
নারী তুমি আর কত প্রহর অনিদ্রায় কাটাবে!
বিশ্বদ্বারে গমনপূর্বে যেখানে হয় গো ঠাঁই, সে তো নারী তোমারি গর্ভে–
তোমারি কারণে এসেছি আমি, দেখেছি দু-চক্ষু মেলে আধাঁর ছেড়ে– আলোর হাতছানি ।
ভরে ওঠে তখন নিষ্পাপ মন তোমারি গর্বে,
নারী তুমি তো নও দাসের গোলাম? নও কোনো ভিন্নরাশি;
তবে কেনো তুমি অকারণ অপমানে তুলে নেও মরণফাঁসি!
আরে তুমি তো মায়ার বাঁধন, নারীরূপে আবির্ভাব হও করে পূণ্য সাধন।
নারী তুমি তো যোদ্ধা, দুঃসাহসী, দুরন্ত বীর
তুমি কখনও মায়াবী আদলে হয়ে যাও স্থির।
তুমি চলচঞ্চল অট্টহাসি রাগিয়া চেয়ে তুলো ত্রিনয়ন!
তোমায় ছাড়া থমকে দাঁড়াবে সমস্ত এ ভুবন।
নারী আর থেকো না তুমি নির্বাক নিশ্চুপ। তুমি ভূকম্পন ক্ষ্যাপা জ্বলন্ত আগ্নেয়কূপ।
নারী লুকিও না কুটির কোণে তোমার মস্তক
তুমি চিরসৃষ্টি মায়া, পৃথিবীর তুমি দত্তক।
নারী তুমি তনু হতে তনুলতা, তুমি বিশ্বসৃষ্টি ইতিহাসে আধেয় কথা,
নারী গর্জে ওঠো, তুমি উচ্চ কর শির– রক্ষার্থে কখনও তুমি রাধেয়কর্ণতীর।
নারী তুমি তো চিরন্তন শিখা আর বটবৃক্ষের শীতলছায়া–
নারী তুমিতো কোমলমতি, তোমায় দ্বারা ভূস্বর্গ ঘেরা দিয়ে মলিন মায়া।
নারী তোমারই প্রতীক্ষায় আজ সমস্ত সৃষ্টি
কানন সোহাগে রূপময় কর ভুবন ছড়িয়ে পুষ্পবৃষ্টি।
নারী তুমি তো বোন, কখনও প্রেমী, আর চিরচেনা ঐ জননী;
নারী যদি গুটিয়ে নাও তোমার ঐ হস্ত দুটি তবে মূল্যহীন এ সৃষ্টি,
শুন্য ঘরের মতো পড়ে রবে এই ধরণী।

পিঁয়াজ-রসুনের বাতচিত

ফাতিহুল কাদির সম্রাট

হঠাৎ পিঁয়াজ বাবু ভীষণ ক্ষেপিয়াছেন বাংলা ভাষাবিদ আর ব্যাকরণপ্রণেতাদের ওপর। তাহার ক্ষোভের কারণ পিঁয়াজ-রসুন জোড়শব্দ। রসুনের সাথে জোড়বদ্ধ উচ্চারণে তাহার আর জাত থাকিতেছে না যেনো।

বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে জোড়শব্দগুলির অধিকাংশে বিপরীতধর্মী বিষয়কে হাইফেনে গাঁথিয়া সমান্তরালে আনিবার একটা প্রচেষ্টা আছে। যেমন- ধনী-গরিব, ভালো-মন্দ, জোড়-বিজোড়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি। সমাসের জাতে ইহা দ্বন্দ্ব সমাস। দুই মেরুর মিলন যেমন অসম্ভব তেমনি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের দুই জাতের মিলনও অসম্ভব। দ্বন্দ্বসমাসের নামের মধ্যে বস্তুসমূহের বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের যে আভাস খেলা করে তাহা আজকাল পিঁয়াজ বাবুকে সংক্রমিত করিয়াছে। আভিজাত্যের গৌরবে মানুষ যেমন জাতভাইয়ের পঙক্তিতে বসিলে জাত হারাইবার আশংকা করে, তেমনি আজকাল রসুনের সহিত তাহার নামোচ্চারণে নিজের আভিজাত্যের তিলক খসিয়া পড়িবার আশংকা করিতেছেন পিঁয়াজ মহাশয়।

শুধু কি ব্যাকরণবাগিশদের প্রতি ক্ষোভ, পিঁয়াজ বাবুর ক্ষোভ আজকাল দোকানিদের প্রতিও। তাহারা রসুনের পাশের ডালায় তাহাকে সাজাইয়া রাখে, ইহাতেও তাহার গা-জ্বালা করে। নিদেনপক্ষে উপরের তাকে অভিজাত মাল্টিন্যাশনাল প্রডাক্টের কাতারে শামিল না হইলে তাহার যেনো আর চলিতেছে না। নাদান দোকানিরা তাহার আভিজাত্যের কদর বুঝিতেছে না বলিয়া তাহার ক্ষেভের অন্ত নাই।

সেদিন পাশের ডালা হইতে একটি ধবধবে রসুন আসিয়া কীভাবে জানি পিঁয়াজের ডালায় নিপতিত হইল। ইহাতে পিঁয়াজ ছি! ছি! বলিয়া আঁতকাইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে ব্রাহ্মণের সামনে অসুস্থ নাচার গফুর নতজানু হইয়া বসিবার পর ব্রাহ্মণ তর্করত্ন যেমন সপাটে দুই পা পিছাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আ, মর! ছুঁয়ে ফেলবি নাকি?' তেমনি পিঁয়াজ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। রসুনের স্পর্শে তাহার জাত আর থাকিল না বুঝি। রসুন পিঁয়াজের এই আচরণের রহস্য বুঝিতে অপারগ হইল। কিন্তু তাহারও বহুকালের আভিজাত্যের আঁতে ঘা লাগিতে দেরি হইল না। সে বলিয়া উঠিল, ও আমার ব্রাহ্মণ রে। বাতাসের ভাপে যাহার স্থান হয় নর্দমায় তাহার আবার জাত। যাহার সাথে আমাকে কেহ রাখে না পচন সংক্রমিত হইবার ভয়ে, তাহার আবার আভিজাত্যের দেমাগ।

পিঁয়াজ বক্র হাসিতে মুখ ফুলাইয়া বলিল, জমানা বদলাইয়াছে বাছা। আজকাল সমাজে কাহাদের কদর দেখছো না? নর্দমায় যাহাদের থাকিবার কথা তাহারাই তো আজ সু-উচ্চ অট্টালিকায় আলিশান অবস্থায়। ছোটো ছোটো মানুষগুলিই তো বড় বড় কেদারাসমূহ দখল করিয়া বসিয়া আছে। তোমার মতো শুভ্রচরিত্রের ঋষিতুল্য মানুষদের কষিয়া মারিতেছে পচা বাবুরা।

পিঁয়াজ বক্র হাসিতে মুখ ফুলাইয়া বলিল, জমানা বদলাইয়াছে বাছা। আজকাল সমাজে কাহাদের কদর দেখছো না? নর্দমায় যাহাদের থাকিবার কথা তাহারাই তো আজ সু-উচ্চ অট্টালিকায় আলিশান অবস্থায়। ছোটো ছোটো মানুষগুলিই তো বড় বড় কেদারাসমূহ দখল করিয়া বসিয়া আছে। তোমার মতো শুভ্রচরিত্রের ঋষিতুল্য মানুষদের কষিয়া মারিতেছে পচা বাবুরা। কাজেই সাবধানে কথা বলিবে। ইহা যুগের হাওয়া, যাহা লাগিয়াছে আমার গায়ে।

কাজেই সাবধানে কথা বলিবে। ইহা যুগের হাওয়া, যাহা লাগিয়াছে আমার গায়ে। পচার বাজার এখন রমরমা। তাইতো মানুষ পচা পরিষ্কারের সাবানের নাম পর্যন্ত পচা রাখিয়াছে। তুমি তোমার সনাতনি চিন্তাধারা পরিত্যাগ করো, ভালো হইবে।

রসুন পরিহাস ভরিয়া বলিল, কথাটা তুমি বেঠিক বলিয়াছ, বলছি না। কিন্তু এই যুগের হাওয়া কাটিয়া যাইতে সময় লাগিবে না। নর্দমার কীটরা নর্দমাতেই ফিরিয়া যাইবে, পচাদের জায়গা হইবে ডাস্টবিন আর ভাগাড়ে। পিঁয়াজ এইবার ভীষণ ক্ষেপিয়া উঠিল। বলিল, তুই বারবার পচা পচা বলিয়া আমার গায়ে জ্বালা ধরাইতেছিস। রসুন পিঁয়াজের এই 'তুই' সম্বোধনে ভীষণ মনোকষ্ট পাইল। সে বলিল, আমাকে তুমি 'তুই' বলিয়াছো, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কারণ 'ছোটলোক বড় হলে বাপকে ডাকে শালা' প্রবাদটি তো আর এমনিতে সৃষ্টি হয় নাই। তোমার ছোটোলোকি মানসিকতায় জাতভাই হিসাবে আমি খুবই লজ্জিত হইলাম।

পিঁয়াজ বাবু এইবার হাসিয়া খুন। তিনি বলিলেন, লজ্জা, হা হা হা! লজ্জা নামক কথাটি বহুদিন পরে তোর মুখ হইতে শুনিলাম। যাহার অস্তিত্ব দেশে নাই, তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি কেবল বোকারাই করে। আগামীতে লজ্জা শব্দটি অভিধানে বর্জিত বলিয়া ঘোষিত হইবে ইহা নিশ্চিত। শোন, এত কথা শুনিবার সময় আমার নাই। আমি দীর্ঘ বিমান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। ভীষণ ক্লান্ত। আর হ্যাঁ, বিমানভ্রমণের কথা তো আবার তোকে শুনাইয়া কোনো লাভ নাই। তুই তো আসিস জাহাজের কার্গোর বদ্ধ কুঠুরিতে করিয়া মাসের পর মাস ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া। তুই বুঝিবি না আকাশের পথে শাঁ করিয়া ভ্রমণের আনন্দ ও ক্লান্তি কী জিনিস। তোর মতো ফেলনা আলিদের এইসব আভিজাত্যের গল্প শুনাইয়া লাভ নাই। বিমানে চড়িবার সৌভাগ্য তোর কখনো হইবে না। অতএব ভাগ এখান হইতে। রসুন বলিল, তোমার বিমান ভ্রমণের কথা মিথ্যা নহে। সুদূর তুরস্ক হইতে আসিয়াছো। আসলে যাহাদের রিকশায়ও চড়িবার কথা নহে, আজকাল তাহারাই তো গাড়িতে চড়ে, বিমানে উড়ে। বিমানভ্রমণে কাহারো মান বাড়িলে বিমানবালারাই তো সমাজে সবচাইতে উচ্চাসন পাইবার কথা। আমি জাহাজে চড়িয়া দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করিয়াও থাকি সতেজপ্রাণ। আর তুমি অল্পপ্রাণ, পচনশীল। জাহাজে চড়িলে অকালে পচিয়া সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবে। মৎস্যকুলও তোমাকে ভক্ষণ করিবে না।

পিঁয়াজ এইবার ধৈর্যহারা হইয়া গেল। সে বলিল, তোর বকবকানিতে আমি ত্যক্ত আর নীতির কচকচানিতে বিরক্ত। নীতির অপমৃত্যু যে দেশে নিয়তি, সেইখানে নীতির সাপোর্টাররা নেহাৎ অচল মাল। নিজেকে তুই যতই ঋষি মনে করিস, মানুষে কিন্তু বলে 'সব রসুনের এক গুয়া'। তুই যদি এতই ভালো কিছু হইয়া থাকিস তাহা হইলে অসাধু মানুষের স্যাঙ্গাতভাবের উপমায় তোকে টানিয়া আনিত না। রসুন বলিল, হা হা হা। যে ব্যাকরণ আর ভাষাবিদদের প্রতি তোমার আজকাল উষ্মাভাবের অন্ত নাই, তাহাদের প্রতিই দেখিতেছি ভীষণ আস্থাভাব। ইহা তোমার হিপোক্রিট চরিত্রের প্রমাণ। আমাকে লইয়া তো ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট কখনো তৈরি হয় নাই। মুনাফাখোররা মানুষকে জিম্মি করিবার উপলক্ষে এক গুয়া হইয়াছে কিন্তু তোমাকে লইয়াই।

পিঁয়াজ কথার ঘা খাইয়া কিছুটা বিহ্বল হইয়া বলিল, তোর গা হইতে ঝাঁজ আসিতেছে। তুই ভাগ আমার জায়গা হইতে। রসুন বলিল, তোমার ঝাঁজ দিন দিন যেভাবে কমিতেছে, তাহাতে আগামীতে তোমার অবস্থান হইবে সবজির কাতারে। মানুষ আলু-মুলা দিয়া পিঁয়াজ রান্না করিবে। অপেক্ষা করো। আগে মানুষ তোমাকে কাটিতে কাঁদিত এখন মানুষ কাঁদে তোমাকে কিনিতে। আর শোনো, আমার ঝাঁজে মানুষের হৃদযন্ত্র বাঁচে। ডাক্তারের কাছে যাও, আমার মাহাত্ম্য শুনিতে পাইবে। প্রতিদিন আমার একটি কোয়া সবল হৃদযন্ত্রের গ্যারান্টি দেয়। আমি আমার কোয়াগুলোকে একসাথে ধরে রাখি। এভাবে আমি মানুষকে ঐক্যের শিক্ষা দেই। আমি সফেদ শুভ্রতার প্রতীক। তবে আমার একটা দুঃখ আছে বৈকি! তাহা হইল, বোকা বাঙালি আমার গুরুত্ব বুঝিল না। তাহারা হৃদরোগ হাসপাতালে যায়, আমাকে খায় না। যাহা হউক, তোমার সাথে কথা বলা বোকামি। তুমি থাকো তোমার মিথ্যা অহমিকা নিয়া। আমি যাই।

দোকানি আসিয়া রসুনটিকে পাশের ডালায় সরাইয়া রাখিল।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর

মানুষ হবো কি?

মাহবুব উল আলম

সম্প্রতি পিকেএসএফের কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সিদীপের একজন কর্মসূচি কর্মকর্তা হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় ছয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে আমার। উদ্দেশ্য ছিল 'মেধা ও মননে সুন্দর আগামি' এই স্লোগানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করে গড়ে তোলা। পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষা, সৃজনশীলতার চর্চা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি স্কুল ফোরাম গঠন এবং ৬টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন।

৬টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম তারা কী হতে চায়– উত্তরে তাদের কেউ হতে চেয়েছে ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক, কেউ পুলিশ কর্মকর্তা, কেউ সেনা কর্মকর্তা, কেউ আইনজীবী। তাদের এই হতে চাওয়াকে সাধুবাদ জানাই। খুব আশাবাদী হই যখন ওদের মাঝে একজন বলে আমি বিজ্ঞানী হতে চাই, একজন বলে আমি চিত্রশিল্পী হতে চাই, একজন বলে আমি ফুটবল খেলোয়াড় হতে চাই এবং খুব বেশি আশাবাদী হই যখন এতো জনের মাঝে অন্তত একজন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে, আমি ভাল মানুষ হতে চাই।

জিপিএ ৫ পাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতার এই যুগে মানুষ হতে চাওয়া এক বিশাল ব্যাপার। আমাদের সন্তানেরা আজ বেড়ে উঠছে জিপিএ ৫ পাওয়ার অশুভ প্রতিযোগিতা করে। অভিভাবক থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন, স্কুলের শিক্ষক সবাই এই প্রতিযোগিতায় শামিল। মাঝখানে পড়ে শিশুকিশোরেরা হারাচ্ছে তাদের সোনালি শৈশব, দুরন্ত কৈশোরকাল, সাথে মূল্যবোধটাও। এসব নিয়ে কারোরই তেমন মাথাব্যাথা নেই। প্রতিটা বাবা-মা চান সন্তান এ+ পাক, শিক্ষক চান তার বিদ্যালয়ের সবাই এ+ পাক, এমনকি স্কুল কমিটিও চায় সকল শিক্ষার্থী এ+ পাবে, নিদেনপক্ষে শতভাগ পাসতো চাইই চাই। আর তা যেকোন মূল্যেই হোক। তা নাহলে এ বছরে যে বোর্ডে, জেলায়/উপজেলায় বা কমপক্ষে ইউনিয়নের সেরা স্কুল তকমাটা পাওয়া হবে না। সেরা হওয়ার প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই আমাদের সন্তানদের ভাল মানুষ হওয়ার শিক্ষাটা দিতে। এমনকি তাদের কখনো মনে করিয়ে দেয়ারও সময় হয়ে ওঠে না কিংবা প্রয়োজনই বোধ করি না যে, জীবনে যাই হই না কেন সবার আগে মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

অবাক হতে হয়, ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে আজ যেন মানুষের বড়ই অভাব। শিক্ষককে মানুষ গড়ার কারিগর বলা হলেও আমরা দেখতে পাই বেশিরভাগ শিক্ষকই মানুষ গড়ার চেয়ে এ+ পাওয়ানোকেই সফলতা মনে করছেন। শহরগুলোতে আজকাল শিক্ষকদেরও বিজ্ঞাপন দেখা যায়। নিশ্চিত এ+ পেতে হলে আজই আসুন অমুক স্যারের তমুক কোচিং সেন্টারে। কিংবা দেখা যায়– এখানে এ+ পাওয়ার গ্যারান্টি দিয়ে পড়ানো হয়। মানুষ করার গ্যারান্টি আজ আর কেউ দেয় না। দিবেই বা কেন? বাবা-মায়েরাও যে আজ আর শিক্ষককে বলেন না, "স্যার, আমার সন্তানকে মানুষ করে দিয়েন।" মানুষের তো আজ চাহিদাই নেই!

আমি বরাবরই একজন আশাবাদী মানুষ। আর তাই স্বপ্ন দেখি একটি স্কুল হবে যেখানে মানুষ গড়া হয়। যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলবে– আমি একজন মানবিক ডাক্তার হতে চাই, একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চাই, একজন সৎ পুলিশ কর্মকর্তা হতে চাই, একজন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা হতে চাই, একজন নীতিবান আইনজীবি হতে চাই– যাই হইনা কেন, সবার আগে মানুষ হতে চাই। শুধুই মানুষ।

লেখক : প্রোগ্রাম অফিসার, সিদীপ

ছোট উঠান

সারমিন আক্তার

সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার, সিএন্ডবি বাজার, বেড়া, পাবনা

ছোট একটি বাড়ি ছোট একটি উঠান
মাঝ উঠানে পাটি পেড়ে
সিদীপ শিক্ষিকা পড়ান
শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি।
সকল শিশু-কিশোর মিশে
ছোট বাড়ির উঠান
গাছের ছায়ায় মৃদু হাওয়ায়
জুড়ায় দেশপ্রাণ।
ছোট আমার গ্রাম, ছোট কিছু প্রাণ
সিদীপ শিক্ষিকার উঠান
উঠান জুড়ে মেলা বসেছে
দেখলে জুড়ায় মনপ্রাণ
সিদীপ শিক্ষিকার উঠান।

খোলা চোখে

মাহ্‌ফুজ সালাম

হিমেল হাওয়া থিথ থিরে শীত আসল কাঁপন
আসল বাতাস শিশির ধোয়া কষ্ট যাপন
অনাথ শিশু শুয়ে আছে উদোম গায়ে
ছুটছে মানুষ উহু শীতে ব্যস্ত পায়ে।

গায়ে ওদের লেপকাঁথা নেই, পথের ধারেই
শুয়ে থাকে, এমনি ভাবেই রাত পোহাবেই
কষ্ট যাদের নিত্য সাথী নিত্য দিনই
আমরা ওদের দিন যাপনের হিসেব জানি।

বস্তি আছে, ওদের থাকার ঘরবাড়ি নেই
স্বস্তি পেলেই পথের শিশু পথ যেখানেই
জীবন এসে থমকে দাঁড়ায় আলো হারায়
বিদিশরা আলোর মাঝে অন্ধকারেই।

আমরা যারা এমন দিনে আগলে থাকি
মায়ের কোলের আদর মাখা পরশ পাই
একটু এসে দাঁড়াই হেসে দিন যাপনের
কষ্টে মিশে সাম্য মৈত্রির গান গাই।

নাম: মারুফ হোসেন
রোল: ৩
বয়স: ৮

জোছনায় অমানিশা

গোলাম কুদ্দুস চঞ্চল

আকাশ জুড়ে পূর্ণিমা চাঁদ
জোছনা ভেঙে পড়ে
মায়ের স্নেহ নেই কোথাও
মনটা কেমন করে।

যেদিন মা তুই হারিয়ে গেলি
নিভে গেছে আলো
পুর্ণিমাতেও জীবন যেন
অমানিশার কালো।

নাম: মিস তাছফিয়া আক্তার
গ্রাম: হোসেনপুর
শ্রেণি: ৫ম

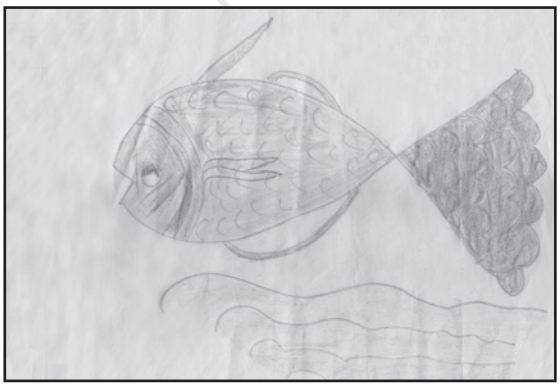

নাম: সাথী আক্তার
গ্রাম: হোসেনপুর
রোল: ১৮
শ্রেণি: ২য়

সন্ধ্যা

হাসান মোস্তাফিজ

তুমি বলে সন্ধ্যা হয়েছো?
ঠিক শুনেছি নাকি ভুল?
চোখে এই কয়দিন ভালো দেখি না জানো
মানুষ কত কিযে বলে,
তুমি বলে রাতকে ছেড়ে সন্ধ্যা হয়েছো
ধূসর আকাশে নিজেকে ছেড়েছো ক্লান্তিহীন অবসরে।

তবে কি দূরে কোথাও চলে যাবে?
তাহলে তো সময় কম তোমার,
কোথায় যাবে ঠিক করেছো?
আমি বলি চলে যাও বরফের দেশে
যেখানে আঙ্গুল ভাঙলেও ব্যাথা অনুভূত হয় না,
তাই শীতের অত্যাচারকে ভুলে
আজীবন সন্ধ্যা সেজে প্রতারকদের হাসাতে পারবে,
আর আমি থেকে যাব ছেঁড়া পৃষ্ঠার আর্তনাদে।

নাম: রমজান হাচান
রোল: ১১
শ্রেণি: ১ম
বয়স: ৭

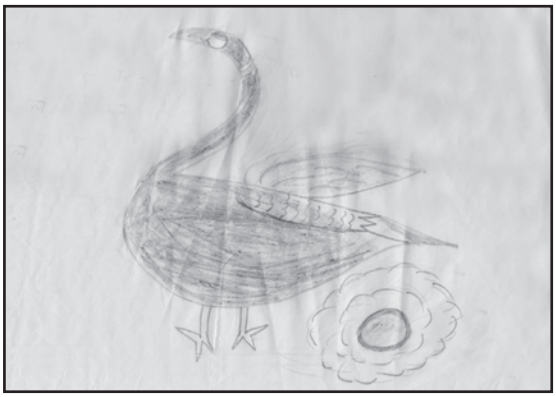

নাম: তামান্না আক্তার
রোল: ৪
বয়স: ৮

বিজয়ের ছড়া

আশরাফ পিন্টু

বিজয় এলেই মনে পড়ে
একাত্তরের কথা
বিজয় এলেই মনে পড়ে
ভাই হারানো ব্যাথা ।
বিজয় এলেই মনে পড়ে
বাঙালি বীর্যবান
বিজয় এলেই মনে জাগে
খুশির জয়গান ।
বিজয় এলেই ভেসে ওঠে
একটি সূর্য লাল
বিজয় এলেই জয়ের সুর
ভাসে তাল-তমাল ।

নাম: মারিয়া আক্তার
রোল: ২২
বয়স: ১০

স্কুলে দুপুরের খাবার

অলোক আচার্য

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার শুরু এবং ভিত্তি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো এই স্তরেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। আমাদের দেশেও সরকার ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে দীর্ঘদিন থেকে আলোচনায় থাকা 'জাতীয় মিড ডে মিল নীতি-২০১৯'-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। বিনামূল্যে বই বিতরণের পর এটি সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। সারাদেশে বর্তমানে ৬৬ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১শ ৪ উপজেলার ১৫ হাজার ৩৮৯টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে দুপুরে খাবার দেয়া হয়। এর ফলে বেড়েছে উপস্থিতির হার। মূলত শিশুদের পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে, উপস্থিতির হার বাড়াতে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগ ধরে রাখতে এই প্রকল্প অত্যন্ত কার্যকর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা বেসরকারি স্কুলের সাথে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শতভাগ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সবকিছু ভালো হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রী কিন্ডারগার্টেনের দিকে ঝুঁকছে। ফলে প্রায়ই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে যেসব বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের কার্যক্রম চালু রয়েছে সে বিদ্যালয়গুলোতে যখন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে তখন অন্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হেরফের হবে না বলেই বিশ্বাস। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের সন্তান যাদের বাড়িতে পুষ্টিমান নিশ্চিত হয় না তারাও এর ফলে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। অভিভাবকরাও আগ্রহী হবে সন্তানকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে। শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকদের একটু সমন্বয় থাকলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। ২০২৩ সালের মধ্যে সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হবে। খাদ্য তালিকায় রান্না করা খাবার, ডিম, কলা ও বিস্কুট থাকবে।

সময়ের সাথে সাথে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কয়েকটি সিদ্ধান্ত সবার সাধুবাদ পেয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে আগামী বছর থেকে শুরুতেই শিক্ষার্থীকে স্কুল ড্রেস বা পোশাক বিনামূল্যে দেয়া, তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল এবং তার বদলে কয়েকটি মানদণ্ডে মূল্যায়ন এবং স্কুল ফিডিংয়ের কার্যক্রম হাতে নেয়া। দেশের লাখ লাখ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য এতসব নিশ্চিত করা যে বিশাল একটি চ্যালেঞ্জ সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু

এর সবগুলোই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং এর গুণগত মানকে আরও বেশি কার্যকর করে তুলবে। এতদিন বছরের শুরুতে নতুন বই নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফিরতো শিক্ষার্থীরা। এখন তার সাথে যদি স্কুলের পোশাকও হাতে পায় তাহলে আনন্দের মাত্রা যে আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় একটি বড় পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তন তখনই কার্যকরী সুফল বয়ে আনবে যখন এর সাথে লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করা যাবে।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ইত্যাদি পৌঁছে দিচ্ছে। লেখাপড়ার পরিবেশ আনন্দদায়ক করতে প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন যারা নিয়োগ পাচ্ছে তারা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিত। বিনা বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণসহ আরও সুযোগ-সুবিধা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে। অপরদিকে কিন্ডারগার্টেনগুলোতে লেখাপড়া করা শিশুদের মাসে মোটা টাকা বেতন দিতে হয়, অতিরিক্ত বই কিনতে হয়।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নীতকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে মিড ডে মিল কার্যক্রম অন্যতম। আশা করা যায়, এটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সেইসাথে শিক্ষার মানে জোরারোপ করতে হবে। মূলত সবকিছু থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকতায় আন্তরিকতার ঘাটতি আজও রয়েই গেছে। আগে যে শিক্ষকদের শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য কাজ করতে হয়েছে সংসার চালানোর চিন্তায়, এখন তো আর তা করতে হচ্ছে না। অন্তত আগের সেই চাপ আর নেই। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বেশি মনোযোগী হওয়া যায়। তবে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষক সংকট। ধীরে ধীরে এই স্তরের প্রতিটি ধাপ উন্নত দেশের মতোই করা হবে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার যুগান্তকারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিড ডে মিল বড় ভূমিকা রাখবে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বর্তমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা

হাসান রাউফুন

শিক্ষা গ্রহণ জীবনের জন্য প্রয়োজন। শিক্ষা বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্জন করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন: প্রাক-প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধমিক, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি। দেশে মানবশক্তি ও মানবিকতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ও তা সম্পন্ন হয়েছে। যার কিছু হলো: স্কুলে শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান, ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করা, ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার ভিত্তি। সেই ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে কোমলমতি শিশুরা বিদ্যালয়গামী হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মনোরম পরিবেশে আনন্দ উৎসাহের সাথে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া আছে: সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ চালুর পাশাপাশি শিশুদের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ, বর্ধিত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণ, মিড ডে মিল কার্যক্রম, দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে– বিদ্যালয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

আবার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও দিয়ে বাংলাদেশের সকল স্কুলে 'স্কুল ফোরাম' এবং গ্রামে গ্রামে 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব' গঠন করে তাদের মানসিক উন্নয়ন, পড়ালেখা, দক্ষতা ও সুসম্পর্ক তৈরি, সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি (কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা) ইত্যাদি কার্যক্রম চলছে।

উপরোক্ত সকল পদক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা রাখছে এবং দেশ নিরক্ষরতা থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক : : প্রোগ্রাম অফিসার, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, সিদীপ

শূন্য মনে হয়

আবু রায়হান

উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, চারগাছ ব্রাঞ্চ, সিদীপ

আমি তারে,
পারি না এড়াতে।
সে আমার,
হাতে রেখে হাত।
সব কাজ তুচ্ছ হয়,
পাণ্ডু হয় মনে।
সব চিন্তার প্রার্থনা
সকল সময়।
তবুও ভাবি তারে,
মনের অজান্তে।
ভাবতে আমার ভাল লাগে
শুধু তোমাকে।
তোমার মাঝে হারিয়ে ফেলেছি,
আমি আমাকে।
শূন্য মনে হয়,
তবুও শূন্য মনে হয়।

কৌতুক

ফেসবুক থেকে

ছাতক: বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি সিমেন্ট কারখানা

রওনক মারুফ শুদ্ধ

এসএসসি পরীক্ষা শেষ অনেকদিন ধরেই। কোথাও বেড়ানোর ইচ্ছা ছিল। সেই সুযোগ আসলো বাবার কল্যাণে। বাবা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুনামগঞ্জভিত্তিক প্রজেক্টে ঢাকা অফিসে কাজ করেন, মাঝেমাঝে প্রকল্প এলাকায় যান টিমকে সহায়তা দিতে। একদিন বাবা অফিস থেকে বাসায় এসে জানালেন, তিনি ১৭ মার্চ সুনামগঞ্জ যাচ্ছেন। আমি আগ্রহ দেখালাম, যেতে চাই, বাবা সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি, দেরি না করে দ্রুতই বাবার সাথে চলে আসি। সুনামগঞ্জে বাবার বিভিন্ন উপজেলায় ফিল্ড ভিজিট ছিল, তার মধ্যে ছাতকও ছিল। অনেক কারণে সুনামগঞ্জ সফর ছিল বেশ স্মরণীয়।

আমার বন্ধু ও সহপাঠী রাগিবের বাবা ছাতক সিমেন্ট কারখানায় বড় পদে কর্মরত। সেই সূত্রে রেজাউল আঙ্কেলই (রাগিবের বাবা) আমাদেরকে কারখানার অতিথি ভবনে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেন। আমিও মনে মনে বেশ খুশি হই যে, কারখানার ভেতরটা দেখা যাবে। যেই কথা সেই কাজ। ২০ তারিখ সকালে আমরা দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থেকে রওয়ানা হয়ে সকালের নরম প্রকৃতি ও দিগন্তজোড়া সবুজে মোড়া ধানক্ষেত পাশে ফেলে ছাতক রওয়ানা হলাম। পাগলাবাজার, ঝাউয়াবাজার এবং গোবিন্দগঞ্জকে পাশে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম। গোবিন্দগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত রাস্তা বেশ ভাল। আর ছিল অফিসের জিপ, রাফি আঙ্কেল রসিক এবং ভাল গাড়ি চালান। আমরা প্রথমেই গেলাম সুরমা নদীর ঘাট, যেখান থেকে নদী পার হলে প্রায় চলে যাওয়া যায় ছাতক সিমেন্ট কারখানায়। বাবা রেজাউল আঙ্কেলের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারেন তিনি নদীর ওপারে অপেক্ষা করছেন। বাবা আমাকে নৌকায় করে ওপারে নিয়ে আঙ্কেলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ছেলেকে নিরাপদে হাতবদল করে আবার এপারে ফিরে এলেন।

রেজাউল আঙ্কেলের সাথে আমি এসে পৌঁছাই ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ছাতক সিমেন্ট কারখানায়। বর্তমানে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানিই (CCC) বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি সিমেন্ট কারখানা। আমরা গেস্ট হাউজে নেমে ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। এরপর কারখানাটি ঘুরে দেখতে বের হলাম। কারখানার ঘটনা বলার আগে কিছু কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি বাংলাদেশের প্রাচীনতম সিমেন্ট কোম্পানি। এ কারখানা ব্রিটিশ আমলে নির্মিত। সে সময়ে এর নাম ছিল ABC কোম্পানি। যার পূর্ণরূপ 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানি'। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তন করে (CCC) রাখা হয়।

এখন ঘটনায় আসা যাক। আমরা ঘুরছিলাম এবং রেজাউল আঙ্কেল আমাদের সব বুঝিয়ে বলছিলেন। দেখতে পেলাম ১৮ কিমি লম্বা রোপওয়ে দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে লাইমস্টোন আসছে। লাইমস্টোন সিমেন্ট তৈরির প্রধান কাঁচামাল। বড়বড় লাইমস্টোনগুলো কীভাবে ক্রাশারে ছোট করা হচ্ছে তাও দেখলাম। এরপর চূর্ণকৃত লাইমস্টোন ও মাটি মিশিয়ে কিলন (Kiln) নামক ফার্নেসে ১৪০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। এখানে ৬৫% লাইমস্টোনগুড়া এবং ৩৫% মাটি মিশিয়ে পোড়ানো হয় যার মাধ্যমে ক্লিংকার উৎপন্ন হয়। ছাতক কোম্পানিতে ১২০ মিটার লম্বা দুটি কিলন আছে। এখানে কীভাবে লাইমস্টোন ও মাটি পোড়ানো হয় তাও দেখলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ১৪০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় আগুনের রং বেগুনি। সেখানকার একজন কর্মকর্তা আমাকে কিছু ক্লিংকার নমুনা হিসেবে উপহার দিলেন। এরপরে ক্লিংকারের সাথে ৫% জিপসাম মিশিয়ে জটিল প্রক্রিয়ায় সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। এই কারখানা বর্তমানে দৈনিক বিশ হাজার বস্তা সিমেন্ট উৎপাদন করে থাকে। তবে কারখানার যন্ত্রপাতি ও অবয়ব বেশ পুরনো। ক্যাম্পাসের পরিবেশেও আধুনিকতা আনার অনেক সুযোগ আছে। সংস্কার ও যুগোপযোগী করা গেলে কারখানার উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি ক্যাম্পাসের তারুণ্যও ফিরে আসবে।

এক কথায়, ছাতক সিমেন্ট কারখানা ভ্রমণ ছিল আমার জন্য খুবই শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক। আর এ জন্য আমার বাবা, রেজাউল আঙ্কেল, প্রিয় বন্ধু রাগিব (যার সাথে বন্ধুত্ব নাহলে আমি এটা কখনই দেখতে পারতাম কিনা সন্দেহ আছে), রাফি আঙ্কেল (পুরো যাত্রায় তিনি আমাদের ড্রাইভ করে সাহায্য করেছেন) এবং কারখানার কর্মকর্তা আঙ্কেলের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। সিমেন্ট কারখানা ছাড়াও আমি সুনামগঞ্জে আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছি। ওগুলোর গল্প না হয় আরেক দিনের জন্য তোলা থাক।

লেখক: শিক্ষার্থী, ১ম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ, নটরডেম কলেজ

দেশ ও যুব সমাজ

সাব্বির রায়হান

১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস। বাংলাদেশসহ বিশ্বের যুব সমাজের কাছে এ দিবসটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। যুবসমাজকে দেশ গঠনের কাজে সম্পৃক্ত করা, দেশ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে সচেতন করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯৮৫ সাল থেকে দিবসটি বাংলাদেশে পালিত হয়ে আসছে।

একটি জাতির আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল হলো যুব সমাজ। জাতীয় যে কোন আপদকালীন মুহূর্তে যুব সমাজ সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশের যুব সমাজের অতীত অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত ও অহংকারের। ইতিহাস চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, দেশের ক্রান্তিকালে দেশবাসীকে যুব সমাজ আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, মেধা দিয়ে, মনন ও প্রতিভা দিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে।

বর্তমানে যুব সমাজে আগের মূল্যবোধ খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এ জন্য যুব সমাজকে এককভাবে দায়ী করলে ভুল হবে। এরজন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষার বৈষম্য, বেকারত্ব ও নৈতিক অবক্ষয়। অবশ্য গোটা যুব সমাজ এই অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। মুষ্টিমেয় লোকজন এর সাথে জড়িত। বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ভেবে এ অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেতন যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রাখা তাদের কর্তব্য।

যুব সমাজকে অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে সরকারি-বেসরকারিভাবে এগিয়ে আসতে হবে। উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য উপাদান যোগানের মাধ্যমে যুব সমাজকে লাভজনকভাবে আত্মকর্মসংস্থান গ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে ও কর্মদক্ষতার ব্যবস্থা করতে হবে।

চীনাদের একটি প্রবাদ আছে "তুমি যদি কাউকে একটি মাছ খাওয়াতে চাও, তবে আগে তুমি তাকে মাছ ধরার কৌশল শেখাও।" দক্ষতা অর্জনের অন্তর্নিহিত অর্থ এই প্রবাদে আছে। একমাত্র দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যুবসমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

যৌবনই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সততা, আদর্শ, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবকরাই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সঠিক কর্মমুখি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে যুবকদেরও কিছু ভূমিকা পালন করতে হবে। নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে হবে। সন্ত্রাস ও অরাজকতা থেকে দূরে থাকতে হবে। ধৈর্যশীল হতে হবে। সুস্থ

দেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশের মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতীক। মনে রাখতে হবে, জাতির উন্নয়নের মূল শক্তি যুব সমাজ

থাকতে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। আত্মসচেতন ও আত্মকর্মসংস্থানের উপায় খুঁজতে হবে। মা-বাবা ও মুরুব্বিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবকদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এসব কর্ম বাস্তবায়নের জন্যে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবকরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও যুবকদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিপুল সংখ্যক যুবক থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটা বিরাট সুযোগ। বেশ কিছু দেশেরই অনেক দক্ষ শ্রমিক আছে। আবার অনেক দেশ দক্ষ শ্রমিকের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। যুব সমাজ যাতে ভাল কাজ খুঁজে নিতে পারে সে রকম প্রস্তুতি নিয়ে তাদের গড়ে তুলতে হবে।

যুব সমাজ জাতির প্রাণশক্তি, দেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশের মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতীক। মনে রাখতে হবে, জাতির উন্নয়নের মূল শক্তি যুব সমাজ। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মাঝে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে জাগিয়ে তুলতে হবে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল বেকার যুবকদের কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ ও জাতীয় উন্নয়ন সাধনই হোক এখনকার লক্ষ্য।

লেখক: কর্মকর্তা, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, সিদীপ

নেপাল সফর ও হিমালয় দেখা

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

চাকরির সুবাদে এবার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেলাম। সেটা আবার 'হিমালয় কন্যা' বলে পরিচিত অনিন্দ্য সুন্দর নেপাল। নেপালের কথা মনে পড়তেই চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টসহ বিভিন্ন পর্বতের অপরূপ সৌন্দর্য, নাগরকোট, পোখরার ফেওয়া লেক, আর কারুকার্যময় মন্দির। গত ১৯-২৬ অক্টোবর অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে আইডিএফ (ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন) এবং সিদীপ এ দুটি সংস্থার মোট ১১ জন সদস্যের একটি টিম নেপাল ভ্রমণ করি। আমি ছাড়াও সিদীপের টিমে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মো. সিরাজুর রহমান এবং এরিয়া ম্যানেজার মো. আমিনুল ইসলাম। ট্যুরটি ছিল নেপালি এনজিও Centre for Self-help Development (CSD)-এর আমন্ত্রণে। ফলে উক্ত ৮ দিনের সফরে তারাই সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রথম দিন হোটেলে উঠে বাহিরের অন্য এক হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা সিএসডি-র প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে যাই। সেখানে আমাদের ফুল দিয়ে ও উত্তরীয় পরিয়ে আমন্ত্রণ জানান সিএসডি-র প্রধান নির্বাহী Mr. Bechan Giri। সেখানে ১ ঘণ্টার মতবিনিময় সভায় মি. গিরি তার প্রতিষ্ঠান সিএসডি-র কর্মকাণ্ডের উপর তথ্যবহুল একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। আমাদের ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নেপালের মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা। আমরা কাঠমান্ডু ও পোখারা শহরের Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Kavre; Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Banepa; Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd, Syangja; Jalpa Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd., Nadipul ইত্যাদি এনজিও'র সমিতি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ, ব্রাঞ্চ অফিস ও প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন, কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করি। এছাড়া পোখারার Chiplekhunga-এ Muktinath Bikas Bank-এর ব্রাঞ্চ অফিস পরিদর্শন করি। সদস্যরা যে সকল প্রকল্পে টাকা লগ্নি করে তার মধ্যে অন্যতম গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, ধান চাষ, স্ট্রবেরি চাষ ইত্যাদি। সেখানকার সমিতির সদস্যগণ খুবই সুশৃঙ্খল এবং সংস্থার নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সমিতিতে সদস্যগণ একই ধরনের পোষাক পরেন এবং সভার শুরুতে ও শেষে শপথবাক্য পাঠ করেন।

তৃতীয় দিন আমরা কাঠমান্ডু থেকে পোখারা যাই এবং ৩ দিন পর কাঠমান্ডু ফিরে আসি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পোখরা শহরকে 'নেপালের ভূস্বর্গ' বা 'নেপাল রানী' বলা হয়। নেপাল পর্যটন বিভাগের একটি স্লোগান আছে: 'তোমার নেপাল দেখা পূর্ণ হবে না, যদি না তুমি পোখারা দেখ।' পোখারা থেকে বিশ্বের দীর্ঘতম (১৪০ কিলোমিটার) সারিবদ্ধ হিমালয় পাহাড়ের সারি দেখা যায়। পোখারাকে 'মাউন্টেন ভিউ'-এর শহরও বলা হয়। এখান থেকে 'অন্নপূর্ণা' ও মাছের লেজের মতো দেখতে 'মচ্ছ পুচ্ছে' পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়, যা বিশ্বখ্যাত চারটি পর্বতশৃঙ্গের একটি। এই পোখারাতেই আছে অনেক দর্শনীয় স্থান।

কাঠমান্ডু-পোখারা আসা যাওয়ার মুহূর্ত ছিল খুবই আনন্দদায়ক। কাঠমান্ডু থেকে পোখারা দীর্ঘ ৮ ঘণ্টার যাত্রা। সকলে মিলে

উচ্চস্বরে গান ধরে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলা। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কখনও দুই পাহাড়ের মাঝে আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু, খাড়া-ঢালু রাস্তার এক আশ্চর্য সেতু বন্ধন। চারদিকে মনোরম ও রোমাঞ্চকর বিশাল বিশাল পাহাড়। চলতি পথে উঁচু পাহাড় থেকে নিচের দিকে তাকালে যে সৌন্দর্য দেখা যায় তা নয়নভোলানো। নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে নদীগুলো। পোখারা যাওয়ার পথে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নীরবে বয়ে গেছে ত্রিশুলি নদী, যার সৌন্দর্য যে কোন মানুষকে বিমোহিত করবে। নদীগুলোতে কোন মাটি-কাদা নেই, ছোট-বড় পাথরের উপর দিয়ে হালকা স্রোতে বয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। দেখে মনে হয় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে বড় আকৃতির ঝর্ণাধারা। পোখারা শহর দিয়ে আরও বয়ে গেছে Marsyangdi ও Seti নদী। নদীর মাঝে যানবাহন চলাচলের জন্য সেতুর পাশাপাশি রয়েছে ঝুলন্ত সেতু– যা পোখারার সৌন্দর্যকে অনেকগুণ বাড়িয়েছে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ

ভক্তপুর : রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে নেপালের অন্যতম দর্শনীয় স্থান ভক্তপুর। প্রাচীন এ শহরটি ছিল রাজাদের আবাসস্থল। শহরটির বুদগাঁও ও খৌপা নামে আরো দুইটি নাম রয়েছে। এটি মধ্যযুগীয় শিল্প-সাহিত্য, কাঠের কারুকাজ, ধাতুর তৈরি মূর্তি ও আসবাবপত্রের জন্য বিখ্যাত। এখানে দেখা যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের অপূর্ব সমন্বয়। তবে ভক্তপুরের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান হলো দরবার স্কয়ার। এখানে প্রাচীন অনেকগুলো রাজপ্রাসাদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির আছে। ভক্তপুরের উল্লেখযোগ্য আরো কিছু দর্শনীয় স্থান হল পটার্স স্কয়ার, ভৈরবনাথ মন্দির, ভৈরব মূর্তি, রাজা ভূপতিন্দ্র মাল্টার কলাম, ভত্সলা দূর্গা মন্দির, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, সিদ্ধি লক্ষ্মী মন্দির, ফাসিদেগা মন্দির, দত্তনারায়ণ মন্দির, ভীমসেন মন্দির ইত্যাদি। পুরো শহরটিই ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ফেওয়া লেক : এটি নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক লেক। পর্যটকদের আদর্শ বিনোদন কেন্দ্র এটি। লেকের অন্য পাড়টি পাহাড়ঘেরা। পাহাড় বেয়ে চুঁইয়ে নামছে পানি। রঙ-বেরঙের নৌকায় ঘুরে বেড়ানো এবং সেই সাথে হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছি আমরা। লেকটির দৈর্ঘ ৪ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১.৫ কিলোমিটার।

ডেভিস ফল : ফেওয়া লেকের পানি থেকেই উৎপন্ন ডেভিস ফল। এই লেকের পানি ঝর্ণাধারার মত দ্রুতবেগে একটি গুহার মধ্যে পড়ে। গুহার মধ্যে পানি পড়ে বাষ্পের মত জলকণা ছড়িয়ে যেতে থাকে বা বাতাসে উড়তে থাকে। সে এক অসাধারণ অনুভূতি, মোহনীয় পরিবেশ। ডেভিস ফল-এ ঢুকতেই একপাশে হিমালয়ের প্রতিকৃতি তৈরি করা।

মহেন্দ্র গুহা : ডেভিস ফল-এর বিপরীতে চুনা পাথরের একটি গুহা যার নাম মহেন্দ্র গুহা। এই গুহাটি মৃত রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম সাহাদেব-এর নামে। এর ভিতরে ছোট ছোট স্বল্প পাওয়ারের বাল্ব লাগানো আছে। ভিতরে পায়ের নিচে বড় বড় পাথর, স্বল্প আলো, গা-ছমছম পরিবেশ। গুহার ভিতরে হিন্দু ধর্মের প্রধান যুদ্ধ দেবতা মহাদেবের মূর্তি। সেখানে একজন পুরোহিতও আছেন।

শরনকোট : পোখারার শরনকোট পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে পর্বতমালার অপূর্ব দৃশ্য, পোখারা ভ্যালি ও ফেওয়া লেক দেখা যায়। শরনকোট পোখারা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫৯২ মিটার

উচ্চতায় অবস্থিত। একদিকে নতুন সূর্যোদয়, আরেকদিকে সূর্যের প্রথম আলো অন্নপূর্ণা, মচ্ছ পুচ্ছে পাহাড়ে পড়ে প্রথমে লাল বর্ণ এবং কিছুক্ষণ পর সাদা বর্ণ ধারণের দৃশ্য– অভূতপূর্ব! যা দেখার জন্য আমরা সূর্য উঠার আগেই অন্ধকারের মাঝেই শীতকে মাড়িয়ে শরনকোটে পৌঁছাই।

ওয়ার্ল্ড পিস প্যাগোডা : এটি নেপালের দ্বিতীয় বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা, অন্যটি বৌদ্ধের জন্মস্থান, লুম্বিনি-এ। এখানে বুদ্ধের প্রতিমাসহ পবিত্র নিদর্শনসমূহ সজ্জিত করে রাখা। এটি বিশ্ব শান্তির প্রতীক হিসেবে ১৯৭৩ সালে তৈরি করা হয়। ১১০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এখান থেকে আমরা অন্নপূর্ণা পাহাড়কে অনেকটা কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। এছাড়া এখান থেকে পোখারা শহর এবং ফেওয়া লেকের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করেছি।

স্বয়ম্ভূনাথ : স্বয়ম্ভূনাথ নেপালের বিখ্যাত ও প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরগুলোর একটি। এটি কাঠমান্ডু শহরের পশ্চিমে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। মন্দিরে উঠার জন্য আমরা ৩৬৫টি পাথরের তৈরি সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি। মন্দিরে রয়েছে অনেক বানর। বানরগুলো মন্দির চত্বর ও তার আশেপাশে লাফালাফি করছে। এসব বানরকে নেপালিরা 'পবিত্র দূত' বলে মনে করেন এবং তাদের ধারণা বানরগুলো বুদ্ধের কাল থেকেই রয়েছে। বানরের পাশাপাশি রয়েছে অনেক কবুতর। স্তূপে বুদ্ধের চোখ এবং ভ্রু আঁকা আছে। নেপালিদের বিশ্বাস বুদ্ধ তার সুদৃষ্টি পুরো

শহরে দিয়ে রেখেছেন, যার দরুন শহর সব রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের আলাদা আলাদা প্রার্থনার স্থান রয়েছে। প্রার্থনা চাকা ও দেবদেবী দ্বারা পুরো এলাকা বেষ্টিত। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দু একসাথে এখানে আসেন এবং প্রার্থনা করেন। এই জায়গাটি নেপালের ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে পরিচিত।

সপ্তম দিন সিএসডির চেয়ারম্যান শংকর মান শ্রেষ্ঠার (Sankar Man Shrestha) আমন্ত্রণে কাঠমান্ডুর বিখ্যাত 'নেপালি চুলো' হোটেলে ডিনারে অংশগ্রহণ করি। সেখানে তিনি আমাদের সাথে পরিচিত হন এবং সকলের নিকট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানতে চান। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর আমাদেরকে বিভিন্ন খাবারের সাথে নেপালের ঐতিহ্যবাহী স্যুপ (৮ প্রকারের ডাল দিয়ে তৈরি) এবং মোমো পরিবেশন করা হয়। এছাড়া ছিল নেপালের ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবশেষে তিনি আমাদের সকলকে উপহার দেন।

নেপালের সৌন্দর্য ও নান্দনিক শিল্পকর্মের পাশাপাশি আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে তাদের আতিথেয়তা এবং শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। প্রতিদিন আমাদের সাথে থেকে ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করার জন্য ধন্যবাদ জানাই Mr. Bechan Giri-কে। এছাড়া সঞ্চয় ও দ্বিপেন্দ্র জোসির বন্ধুত্বও আমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভ্রমণটি স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আন্দদদায়ক করার জন্য যাকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, তিনি আইডিএফ-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন। নেপাল ভ্রমণ আমাদের সবার জন্য এক অনন্য সুন্দর অভিজ্ঞতা।

লেখক: জুনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম), সিদীপ।

সিদীপের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ। ২৪তম এজিএম সঞ্চালন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া।

সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'আমরা ২৪ পূর্ণ করে ২৫ বছরে পদার্পণ করেছি। ১৯৯৫ সালে মাত্র ২টি বেঞ্চ নিয়ে এই সংস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ আমরা ৫ হাজার গ্রামে আড়াই লাখ সদস্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আর এখন আমরা শুধু ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সৌরবিদ্যুৎ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে সিদীপের কার্যক্রম এখন অনেক বিস্তৃত। আগামী বছর আমরা ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করবো।'

সংস্থার পরিচালক (স্ট্র্যাটেজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট) জনাব মিফতা নাঈম হুদা গত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে সিদীপের ১৬২টি শাখার মাধ্যমে বিগত বছরের ১,৯৮,৩৫৯ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ২,২৭,২৬৯ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে মোট মাঠকর্মী ৮৪৫ জন ও ঋণী ১,৯০,১০৪ জন। বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৫১০.৩৮ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪০.৫৬ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে ৫২.০৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি হয়েছে ২৯৮.৭৫ কোটি টাকা। ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,১৮৫.০৫ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৯৮৬.৭৪ কোটি টাকা। প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয় .০৯ টাকা ও উদ্বৃত্ত ২২৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। কার্যক্রমের স্বয়ম্ভরতা ১৩৮.৯১%। সিদীপের আর্থিক সেবা ছাড়াও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রকাশনা এবং অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

সাধারণ পরিষদের সদস্য জনাব সালেহা বেগম বলেন, 'প্রতিবেদনের উপস্থাপনায় শুনলাম, লাইব্রেরি করা হচ্ছে। এটা করা হবে জেনে খুব আনন্দিত হলাম।'

সাধারণ পরিষদের সদস্য জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন, 'সোশাল কমোডিটির কথা বলা হয়েছে। আমরা ছোটবেলায় দেখতাম ফ্রিজ, টেলিভিশন এগুলো উচ্চবিত্ত লোকজন ছাড়া কারো কাছে ছিলো না। এখন কিন্তু এসব প্রায় সবারই আছে। একসময় যারা এক্সক্লুডেড ছিলো এখন তাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়ছে। অতএব একে সোশাল কমোডিটি না বলে ভিন্ন কিছু বলা প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির আর্থিক ব্যাপারটা ছোট হলেও কর্মের তাৎপর্য অনেক বেশি। আমরা ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের কাঁধে ভর করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছি। আমাদের স্ট্র্যাটেজি হলো সোশাল মার্কেটিং। এডুকেশনে শিক্ষিকারা এক ধরনের ভলান্টিয়ারিজমের মাধ্যমে কাজ করছেন। অর্থের চেয়ে তারা তাদের দেয়া সেবাকে বেশি মূল্য দেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সাধারণ সভাকে সফল করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এরপর আখাউড়া থেকে আগত প্রতিবিন্ধী শিশুদের একটি দল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করে।

উন্নয়ন মেলা-২০১৯ : গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের সেতুবন্ধন

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী

সিদীপ এর স্টল পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং তার ডানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: জসীম উদ্দিন, মো: ফজলুল কাদের, গোলাম তৌহিদ ও অন্যান্য

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ নেটওয়ার্ক তৈরি এবং পরিবেশ ও দরিদ্রবান্ধব প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর আয়োজন করা হয় উন্নয়ন মেলা-২০১৯। ১৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, কয়েকটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও কিছু প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৯০টি স্টলে প্রদর্শিত হয় বৈচিত্র্যময় কারুশিল্প, গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, শতরঞ্জি, খাদ্যপণ্য, গহনাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য। মেলায় প্রদর্শিত হয় সেইসব প্রান্তিক কৃষক-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য যারা একসময় ছিলেন নিঃস্ব-নিরুপায়। পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরলস তৎপরতায় তারা চিনে নিয়েছেন এগিয়ে যাবার পথ।

মেলায় এমন কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য ছিলো যা দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে। ফরিদপুরের কমরপুর থেকে পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি সংগ্রহ করে এনেছিলো ১৪ ফুট উচ্চতার একটি কচুগাছ যা 'দম্ভা মান কচু' নামে পরিচিত। এছাড়াও তাদের স্টলে ছিল ১৭ কেজি ওজনের মিষ্টি কুমড়ো। বগুড়ার গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) তাদের স্টলে নিয়ে এসেছিলো আড়াই কেজি ওজনের

বেল। দেখতে সাধারণ বেলের মতো হলেও আকারে বড় এই বেল খাওয়ার প্রক্রিয়াও ভিন্ন। সবজি হিসেবে রান্না করেই কেবল খাওয়া যায় এই বেল। মেলায় বাহারি স্বর্ণসদৃশ গয়না (ইমিটেশন) নিয়ে হাজির হয়েছিল ঝিনাইদহের মহেশপুরের শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। খাঁটি মধুর নিশ্চয়তা দিয়ে উদ্দীপন সংস্থা বাক্সবন্দী চাকসহ মধু নিয়ে এসেছিলো। বাঙালি ঐতিহ্যের অংশ কাঁসা-পিতলের তৈরি নিত্য ব্যবহার্য বাহারি সম্ভার দিয়ে স্টল সাজিয়েছিল শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। বেশ কয়েকটা স্টলে দেখা গেছে কাঁকড়া, কুচিয়া, সামুদ্রিক শৈবাল, বাহারি মাছ ইত্যাদি।

অধিকাংশ স্টলই কারুশিল্প ও হাতের কাজের মনোহর জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বেতের কাজ আর বাবুই পাখির বাসা দিয়ে সাজানো রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন, বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি ইএসডিও অথবা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর হাতের কাজে শোভামণ্ডিত ছিলো গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। বাঁশ-বেত, খেজুর পাতা, নারকেলের ছোবড়া, কাঠ দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, শোপিস, খেলনা, একতারা, কলমদানি, মোমদানি, ফুলদানি, জামদানি ও সুতি শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, চাদর-শাল, নকশি কাঁথা, কুশন কাভার ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিল্পীমন ও কারুদক্ষতা।

মেলায় বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল নানা ধরনের ও স্বাদের বিস্কুট, চানাচুর, সারমুক্ত হাতে ভাজা মুড়ি, মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া, বিভিন্ন ধরনের পিঠা, নানা রকমের আচার, ডালের বড়া, মিষ্টি, দই, ঘি, গুড়, মধু, বাতাসা, নাড়ু ইত্যাদি। মেলায় ছিল বিষমুক্ত বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ও পাহাড়ি ফল এবং সবজি। কয়েকটি স্টলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের শুটকি।

নিজেদের তৈরি বিভিন্ন সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামসহ নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে স্টল সাজিয়েছে ডাটা সফট্ সিস্টেমস বাংলাদেশ লি:, পিসি লিংক আইটি পল্লী লিমিটেড, আম্বালা আইটি, সাউথটেক লিমিটেড, স্বস্তি লিমিটেডসহ আরও বেশ কয়েকটি সফটওয়্যারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। তারা দর্শনার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন তাদের তৈরি সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামের সাথে। কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ ও কোর্সের অফার নিয়ে উপস্থিত ছিল কোডারস ট্রাস্ট বাংলাদেশ লিমিটেড, মনটেজ ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেট, ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (এনআইইটি) লিমিটেড।

সিদীপ নিজের প্রকাশিত বইপুস্তক দিয়ে স্টল সাজায়। একুশটি ব্যবসা আপনার জন্য দেশের জন্য, একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তার সফল জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতি পাঠ, আদর্শ বাড়ী কার্যক্রম, গাঁয়ে গাঁয়ে অভিনব শিশুশিক্ষা, আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা, শিক্ষায় সহায়তা ও শিশুদের পড়ানোর কৌশল, কৃষকের পাশে সিদীপ, Health Strategy, ক্ষুদ্রঋণে খেলাপি না হওয়ার উপায় ও প্রতিরোধে করণীয়, ক্ষুদ্রঋণে সঠিক সদস্য যাচাই-বাছাই, সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোক, একটি ভিন্নধর্মী প্রয়াস, জীবন সংগ্রামে জয়ী যারা, উঠান স্কুলের কথা, কিছু শিক্ষাচিন্তা, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বই দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেকেই পছন্দের বই কিনে নেন।

প্রকাশনীর পাশাপাশি সিদীপের স্টলে ছিল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম। এখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা, বিনামূল্যে রক্তচাপ পরিমাপ, ওজন মাপা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিদীপের স্টলে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের সমস্যা সনাক্তকরণ ও ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার এমবিবিএস চিকিৎসকের সাথে অপটোমেট্রি ও লো-ভিশনে ডিপ্লোমাধারী ২ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এসকল সেবা প্রদান করেন।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দেশব্যাপী নানাধর্মী ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন ও বিকাশের কোন বিকল্প নেই। ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যেমন উন্নয়ন ধারায় যুক্ত করা সম্ভব, তেমনি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তা দেশের বেকারত্ব সমস্যা মোকাবিলায়ও সহায়ক হবে। উন্নয়ন মেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও ক্রেতামহলের সাথে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের সংযোগ সৃষ্টি হয়। তাদের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের ফলে পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমানে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আশাব্যাঞ্জকভাবে শেষ হয় মিলন মেলা, উন্নয়ন মেলা।

চালু হলো সিদীপ-শিক্ষালোক দেয়াল গ্রন্থাগার

সিদীপ বিভিন্ন রকম বই-পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। বেশিরভাগ প্রকাশনার একটি করে কপি প্রতি ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়। এর মধ্যে কিছু গবেষণালব্ধ মূল্যবান গ্রন্থও আছে, যেমন: একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তা, একুশটি ব্যবসা আপনার জন্য, কিছু শিক্ষাচিন্তা, হেলথ স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদির কথা বলা যায়। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন, সিদীপ সংবাদ ও শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক' ইত্যাদি পাঠানো হয়।

প্রত্যেক ব্রাঞ্চের দেয়ালে একটি বুকশেলফ বানিয়ে এসব বই গুছিয়ে রাখলে ব্রাঞ্চের কর্মী, শিক্ষিকাসহ অনেকেই পড়তে পারবেন। এরসঙ্গে কিছু গল্প-কবিতা ও শিক্ষামূলক বই রাখলে সংস্থার সদস্যরাও ইচ্ছা করলে এখান থেকে পছন্দের বই ধার নিয়ে পড়তে পারেন। এরফলে সিদীপের প্রত্যেক ব্রাঞ্চকে কেন্দ্র করে সিদীপের কর্মী ও সদস্যদের মাঝে একটা পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আশা করা যায়, দীর্ঘমেয়াদে এর ফল হবে যথেষ্ট ভাল।

এছাড়া সিদীপের উঠান স্কুলের শিক্ষিকাগণ রিফ্রেশার প্রোগ্রামে প্রতি মাসে ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে আসেন। তারা এখান থেকে পছন্দের বই নিয়ে পড়তে পারেন এবং বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারেন। এজন্য শিক্ষা সুপারভাইজারকে কেবল একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে যাতে তিনি বই দেয়া ও ফেরত নেয়ার তথ্যসমূহ লিখে রাখবেন। এভাবে প্রত্যেক ব্রাঞ্চকে কেন্দ্র করে স্বল্প পরিসরে একটি গ্রন্থাগার কার্যক্রম গড়ে উঠবে। এ ধরনের চর্চার ফলে সিদীপের শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং আশা করা যায়, এলাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিবে।

এ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি পাবনা ও সিরাজগঞ্জের সাঁথিয়া, সিএন্ডবি বাজার, শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়া ব্রাঞ্চে শিক্ষিকারা যেখানে রিফ্রেশার আয়োজন করেন সেখানকার দেয়ালে একটি করে বুকশেলফ স্থাপন করা হয়েছে। শাহজাদপুরের বিএম নিজে থেকে ভাল ভাল বই জোগাড় করে বুকশেলফটি সাজিয়েছেন।

৬ নভেম্বর সকালে শাহজাদপুরে শিক্ষিকাদের রিফ্রেশারে বুকশেলফটি উদ্বোধন করেন সিদীপের পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব ফজলুল হক খান। সংস্থা থেকে ২টি বই তিনি উক্ত বুকশেলফে উপহার দেন যা গ্রহণ করেন বিএম জনাব দীপু কুমার কণ্ঠ ও শিক্ষা সুপারভাইজার আসমা খাতুন। ২টি বই সিএন্ডবি বাজার ব্রাঞ্চকে ও একটি করে বই সাঁথিয়া ও উল্লাপাড়া ব্রাঞ্চকে উপহার দেয়া হয়। পরিচালক (প্রোগ্রাম) সিদীপের এ নতুন উদ্যোগ সংস্থার সকল ব্রাঞ্চে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করেন।

শিক্ষিকা রিফ্রেশারে সিএন্ডবি বাজারের বুকশেলফের নাম 'হুরা সাগর গ্রন্থসারি' ও শাহজাদপুরের বুকশেলফের নাম 'করতোয়া গ্রন্থসারি' ঠিক করা হয়েছে। সিদীপের দেয়াল লাইব্রেরি তৈরির এই নতুন উদ্যোগে শিক্ষিকাগণ অত্যন্ত উৎসাহী। সকলেই সিদীপ-শিক্ষালোকের এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেন।

‘আমাদের শিক্ষা : বিচিত্র ভাবনা' বই নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খান সম্পাদিত ‘আমাদের শিক্ষা : বিচিত্র ভাবনা' বইটির ওপর পাবনায় বেড়া, কাশীনাথপুর ও নাটিয়াবাড়ি এলাকার আলহেরা একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কাশীনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজের দশম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী একটি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রী

স্কুল পর্যায়				
ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	অর্জিত স্থান
১	রঙ্গনা ইসলাম তামান্না	দশম	ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	১ম
২	মো. রাকিবুল ইসলাম	দশম	ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২য়
৩	মো. শরিফুল ইসলাম	দশম	ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	৩য়
৪	শ্রাবণী	দশম	ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	৩য়
কলেজ পর্যায়				
৫	সাদিয়া শারমিন আলফা	দ্বাদশ	আলহেরা একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ	১ম
৬	ওয়াসিফ আল আবরার	দ্বাদশ	আলহেরা একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ	২য়
৭	মো. মাহমুদুল হাসান	একাদশ	আলহেরা একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ	৩য়
৮	সামিয়া ইসলাম	একাদশ	কাশিনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজ	৩য়
৯	নুজহাত খন্দকার চর্যা	একাদশ	কাশিনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজ	৩য়

রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা উপলক্ষ্যে ৬ নভেম্বর বিকালে নাটিয়াবাড়িতে ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৯এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ‘আমাদের শিক্ষা : বিচিত্র ভাবনা' বইটি সিদীপ ও প্রকৃতির যৌথ প্রকাশনা।

সিদীপের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে স্থানীয় ‘প্রয়াস সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য জনাব আহমেদ ফিরোজ কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন লেখক আকতার জামান ও ভাস্কর বিপ্লব দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের পরিচালক জনাব ফজলুল হক খান ও এটি সঞ্চালন করেন লেখক আলমগীর খান।

প্রধান অতিথি বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর মাঝে পুরস্কার হিসেবে বই বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি জনাব আহমেদ ফিরোজ কবির, এমপি, তার বক্তব্যে বলেন, অভিভাবকরা যদি শিশুসন্তানের ভেতর স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে পারেন, সেই সন্তান বিপথগামী হবে না কখনও। এখনকার ছেলেমেয়ে অনেক মেধাবী, শুধু দরকার তাদের সঠিক পরিচর্যার, তবেই আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

লেখক আকতার জামান বক্তৃতায় তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় তিনি ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন। বর্তমান প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশগঠনে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

ভাস্কর বিপ্লব দত্ত তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। সার্টিফিকেট অর্জনের সাথে সাথে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে নিজের মেধা বিকাশের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা-ভাবনা প্রকাশ করেন প্রকৌশলী আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জন, কবি ও গীতিকার হুমায়ুন কবির, অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন খান শাহীন, সাংবাদিক অলোক আচার্য, অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক মাহবুব হোসেন, প্রধান শিক্ষক মো. তারেকুজ্জামান ও আরও অনেকে। বক্তাগণ শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করেন।

ছবি: শিল্পী শাহ মাইনুল ইসলামের '৭১ এর শকুন//মাধ্যম: কালি ও কলম

সৃজিত সমর, স্বদেশ ও স্বপ্ন

টি.এম.এম. নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী

গত বছর "অবিনাশী চেতনা" শীর্ষক শিল্পী মাইনুল ইসলাম শিল্পুর একটি প্রদর্শনী বেশ সাড়া ফেলেছিলো। দর্শকের এই প্রতিক্রিয়া এবং শিল্পীর পথ পরিক্রমায় তাঁর এ বারের আয়োজন এই প্রদর্শনী। আগের প্রদর্শনীটি ছিলো শুধু মাত্র বিন্দু ব্যবহার করে সাদা-কালোর বৈপরীত্যে আলো ছায়ায় এমনকি রূপালী আভায় (মিডল টোন) তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর চিত্রাবলী। খুব কম শিল্পীই শুধু মাত্র ডট ব্যবহার করে ছবি এঁকেছেন। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডট ব্যবহার করে সব ছবি উপস্থাপনে শিল্পী সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অনুসঙ্গসহ বাংলাদেশের প্রবাদ প্রতিম মহাপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং নির্মম মৃত্যুর হৃদয় বিদারক প্রসঙ্গ। পূর্বের প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতায় তার এবারেরও বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধ, সেই সাথে যোগ হয়েছে স্বদেশের নিসর্গ এবং নির্মল স্বপ্নের প্রতীক পুষ্প। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাবলীর প্রায় সবকিছুর মাধ্যম (সাদা-কালো, কলম ও ওয়াস, ডট এবং এ্যাক্রেলিক) পুষ্প বিষয়ক ছবির মাধ্যম ও নিসর্গ দৃশ্যাবলী তিনি উপস্থাপন করেছেন জলরং মাধ্যমে। পুষ্প ও নিসর্গ দৃশ্যে নৌকা এবং মানুষের উপস্থিতি। ছবিগুলো বেশ দৃষ্টি নন্দন। ওয়াশের ভেজা ভাব, কোমলতা এবং পেলবতা আনয়নে শিল্পী সফল। বিশেষ করে নৌকার ছবিগুলো সরলীকৃত ও ন্যূনতম কাজে উপস্থাপিত। সাধারণ ভাবে উপস্থাপিত ছবিগুলোতে অসাধারণ মাধুর্য দৃশ্যমান। ফুলের ছবিতে বর্ণময়তার পুষ্পিত সৌন্দর্য উপস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের কিছু ছবিতে তাঁর শিক্ষক প্রয়াত শিল্পী বনিজুল হকের (শিল্পীর অনেক ঘনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয়জন) প্রভাব লক্ষণীয়। প্রভাব থাকলেও তা অনুকরণ না হয়ে অনুসরণ হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবে ছবিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়ে ছবি নিজস্বতা পেয়েছে। ফুল ও নৌকার ছবিগুলোতে শিল্পীর ছাত্র জীবনে করা পুষ্প চিত্র চর্চা (জলরং) ও নৌকার স্কেচের (পেন্সিল ও কালি কলমে করা) প্রভাব লক্ষণীয়। তবে সময়ের সাথে সাথে শিল্পীর যে উত্তরণ ঘটেছে তার প্রতিফল ছবিতে দেখা যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে আগের প্রদর্শনীর ছবিতে শিল্পী যেখানে শেষ করেছিলেন এবারের প্রদর্শনী তা ছাড়িয়ে গেছে। এবারে কিছু ব্যক্তিগত ভাবনা যোগ করে লেখার ইতি টানার ইচ্ছে। সাদা-কালো মাধ্যমে চিত্র-সৃজন আপাত দৃষ্টিতে সহজ-সরল মনে হলেও বর্ণহীনতার কারণে ছবিগুলোর দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনে অবশ্যই দক্ষতা, কুশলতা ও নিপুণ হাতের ছোঁয়ার উপস্থিতি অনস্বীকার্য। প্রদর্শনীর অপূর্ণতা শুধু একটি জায়গায়– একের পর এক প্রদর্শনী আয়োজনে শিল্পী যে ভাবে উত্তরণের পথে হাঁটছেন তাতে আমাদের রস আস্বাদনের চাহিদা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে শিল্পী আরো প্রদর্শনী আয়োজন করে তা পূরণ করবেন বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

লেখক: শিল্প সমালোচক ও প্রফেসর, চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নাম: অদিতি দাস, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, রোল: ০২

পুরস্কার দিচ্ছেন প্রধান অতিথি জনাব আহমেদ ফিরোজ কবির, এমপি